বনী ইস্‌রাঈল

১৭

নামকরণ

চার নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ فِى الْكِتٰبِ থেকে বনী ইস্‌রাঈল নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইস্‌রাঈল এই সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরাতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ সূরাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করার পর তখন ১২ বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পথ রুখে দেবার জন্য তাঁর বিরোধীরা সব রকমের চেষ্টা করে দেখেছিল। তাদের সকল প্রকার বাধা বিপত্তির দেয়াল টপকে তাঁর আওয়াজ আরবের সমস্ত এলাকায় পৌছে গিয়েছিল। আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যার দু'চারজন লোক তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়নি। মক্কাতেই আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদের এমন একটি ছোট্ট দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল যারা এ সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদ ও বাধা–বিপত্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় শক্তিশালী আওস ও খায্‌রাজ গোত্র দু'টির বিপুল সংখ্যক লোক তার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। এখন তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এক জায়গায় একত্র করে ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং অতিশীঘ্রই তিনি এ সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

এহেন অবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ থেকে ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াবাসীকে এ পয়গাম শুনান।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে।

সতর্ক করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বনী ইস্রাঈল ও অন্য জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর দেয়া যে অবকাশ খতম হবার সময় কাছে এসে গেছে তা শেষ হবার আগেই নিজেদেরকে সামলে নাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে দুনিয়ায় আবাদ করা হবে। তাছাড়া হিজরাতের পর যে বনী ইস্রাঈলের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অহী নাযিল হতে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমে যে শাস্তি তোমরা পেয়েছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছো তার সদ্ব্যবহার করো। এ শেষ সুযোগটিও যদি তোমরা হারিয়ে ফেলো এবং এরপর নিজেদের পূর্বতন কর্মনীতির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি আসলে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। তাওহীদ, পরকাল, নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে এ মৌলিক সত্যগুলোর ব্যাপারে যেসব সন্দেহ–সংশয় পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। দলীল–প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অস্বীকারকারীদের অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ধমকানো ও ভয় দেখানো হয়েছে।

শিক্ষা দেবার পর্যায়ে নৈতিকতা ও সভ্যতা–সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর ওপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এটিকে ইসলামের ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আরববাসীদের সামনে এটি পেশ করা হয়েছিল। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটি একটি নীল নক্শা এবং এ নীল নক্শার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দেশের মানুষের এবং তারপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন গড়ে তুলতে চান।

এসব কথার সাথে সাথেই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে মজবুতভাবে নিজের অবস্থানের ওপর টিকে থাকো এবং কুফরীর সাথে আপোশ করার চিন্তাই মাথায় এনো না। তাছাড়া মুসলমানরা যাদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে উঠতো, তাদেরকে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকার এবং প্রচার ও সংশোধনের কাজে নিজেদের আবেগ–অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদেরকে নামাযের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি এমন একটি জিনিস যা তোমাদের সত্যের পথের মুজাহিদদের যেসব উন্নত গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া উচিত তেমনি ধরনের গুণাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের ওপর নিয়মিতভাবে ফরয করা হয়।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ①

পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন, যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান।[১] আসলে তিনিই সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

১. এ ঘটনাটিই আমাদের পরিভাষায় "মি'রাজ" বা "ইস্‌রা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অধিকাংশ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাতের বইগুলোতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিপুল সংখ্যক সাহাবী এ ঘটনা বর্ণনায় শামিল হয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এঁদের মধ্য থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত মালিক ইবনে সা'সা (রা), হযরত আবু যার গিফারী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা)। এঁরা ছাড়াও হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং আরো বিভিন্ন সাহাবী থেকেও এ ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র মসজিদে হারাম (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আক্‌সা (অর্থাৎ বায়তুল মাক্‌দিস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা বর্ণনা করছে। এ সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর নিজের কিছু নিশানী দেখাতে চাচ্ছিলেন। কুরআনে এর বেশী কিছু বিস্তারিত বলা হয়নি। হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ রাতে জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে উঠিয়ে বুরাকের পিঠে চড়িয়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখানে তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে নামায পড়েন। তারপর জিব্রীল (আ) তাঁকে উর্ধ জগতের নিয়ে চলেন এবং সেখানে

আকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিপুল মর্যাদাশালী নবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। অবশেষে উচ্চতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি নিজের রবের সামনে হাযির হন। এ উপস্থিতির সময় অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সংক্রান্ত আদেশ জানানো হয়। এরপর তিনি আবার বায়তুল মাক্‌দিসের দিকে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ প্রসংগে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামও দেখানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, পরের দিন যখন তিনি লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মক্কার কাফেররা তাঁকে ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ করতে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যেও কারোর কারোর ঈমানের ভিত নড়ে ওঠে।

হাদীসের এ বাড়তি বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিরোধী নয়, বরং তার বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রসারিত রূপকে কুরআনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। তবুও যদি কোন ব্যক্তি হাদীসে উল্লেখিত এ বিস্তারিত বিবরণের কোন অংশ না মানে তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে না। তবে কুরআন যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে তা অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী।

এ সফরের ধরনটা কেমন ছিল? এটা কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়? আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সশরীরে মি'রাজ সফর করেছিলেন, না নিজের জায়গায় বসে বসে নিছক রূহানী পর্যায়ে তাঁকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল? কুরআন মজীদের শব্দাবলীই এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। বলা হয়েছে سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى এ শব্দগুলো দিয়ে বর্ণনা শুরু করায় একথা প্রমাণ করে যে, এটি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী একটি অতি বড় ধরনের অসাধারণ তথা অলৌকিক ঘটনা ছিল, যা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন ব্যক্তির এ ধরনের কোন জিনিস দেখে নেয়া অথবা কাশ্‌ফ হিসেবে দেখা কোন ক্ষেত্রে এমন গুরুত্ব রাখে না, যা বলার জন্য এ ধরনের ভূমিকা ফাঁদতে হবে যে, সকল প্রকার দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা কাশ্‌ফের মাধ্যমে এসব দেখিয়েছেন। তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফর বা কাশ্‌ফের মধ্যে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ। আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান।

এখন যদি এক রাতে উড়োজাহাজ ছাড়া মক্কা থেকে বায়তুল মাক্‌দিস যাওয়া আল্লাহর ক্ষমতায় সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসে যেসব বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলোকেই বা কেমন করে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা যায়? সম্ভব ও অসম্ভবের বিতর্ক তো একমাত্র তখনই উঠতে পারে যখন কোন সৃষ্টির নিজের ক্ষমতায় কোন অসাধারণ কাজ করার ব্যাপার আলোচিত হয়। কিন্তু যখন আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, আল্লাহ অমুক কাজ করেছেন, তখন সম্ভাব্যতার প্রশ্ন একমাত্র সে-ই উঠাতে পারে যে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে না। এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিস্তারিত বিবরণ

হাদীসে এসেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি আপত্তিই কিছুটা গুরত্বসম্পন্ন।

এক ঃ এর আগেই আল্লাহর একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় বান্দার সফর করে একটি বিশেষ স্থানে গিয়ে তাঁর সামনে হাযির হবার কি প্রয়োজন ছিল?

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন করে বেহেশ্‌ত ও দোযখ এবং অন্যান্য কিছু লোকের শাস্তিলাভের দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হলো? অথচ এখনো বান্দাদের স্থান ও মর্যাদার কোন ফায়সালাই হয়নি। শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা তো হবে কিয়ামতের পর কিন্তু কিছু লোকের শাস্তি এখনই দেয়া হয়ে গেলো, এ আবার কেমন কথা?

কিন্তু এ দুটি আপত্তিই আসলে স্বল্প চিন্তার ফল। প্রথম আপত্তিটি ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, স্রষ্টার সত্তা নিসন্দেহে অসীমতার গুণাবলী সম্পন্ন, কিন্তু সৃষ্টির সাথে আচরণ করার সময় তিনি নিজের কোন দুর্বলতার কারণে নয় বরং সৃষ্টির দুর্বলতার জন্য সীমাবদ্ধতার আশ্রয় নেন। যেমন সৃষ্টির সাথে কথা বলার সময় তিনি কথা বলার এমন সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা একজন মানুষ শুনতে ও বুঝতে পারে। অথচ তাঁর কথা মূলতই অসীমতার গুণ সম্পন্ন। অনুরূপভাবে যখন তিনি নিজের বান্দাকে নিজের রাজ্যের বিশাল মহিমান্বিত নিশানীসমূহ দেখাতে চান তখন বান্দাকে নিয়ে যান এবং যেখানে যে জিনিসটি দেখাবার দরকার সেখানেই সেটি দেখিয়ে দেন। কারণ বান্দা সমগ্র সৃষ্টিলোককে একই সময় ঠিক তেমনিভাবে দেখতে পারে না যেমনিভাবে আল্লাহ দেখতে পারেন। কোন জিনিস দেখার জন্য আল্লাহকে কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু বান্দাকে যেতে হয়। স্রষ্টার সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারটিও এ একই পর্যায়ের। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজস্বভাবে কোথাও সমাসীন নন। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বান্দা নিজেই একটি জায়গার মুখাপেক্ষী। সেখানে তার জন্য স্রষ্টার জ্যোতির ঝলকসমূহ কেন্দ্রীভূত করতে হয়। নয়তো সীমাবদ্ধ বান্দার জন্য তাঁর অসীম সত্তার সাথে সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় আপত্তিটির ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট। কারণ মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে এমন অনেক জিনিস দেখানো হয়েছিল যার অনেকগুলোই ছিল আসল সত্যের প্রতীকী রূপ। যেমন একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতীকী রূপ ছিল এই যে, একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্য থেকে একটি মোটা সোটা ষাঁড় বের হলো এবং তারপর আর তার মধ্যে ফিরে যেতে পারলো না। অথবা যিনাকারীদের প্রতীকী রূপ ছিল, তাদের কাছে উন্নত মানের তাজা গোশ্‌ত থাকা সত্ত্বেও তারা তা বাদ দিয়ে পচা গোশ্‌ত খাচ্ছে। অনুরূপভাবে খারাপ কাজের যেসব শাস্তি তাঁকে দেখানো হয়েছে সেখানেও পরকালীন শাস্তিকে রূপকভাবে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মি'রাজের ব্যাপারে যে আসল কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ তাঁদের পদ মর্যাদানুসারে পৃথিবী ও আকাশের অদৃশ্য রাজত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন এবং মাঝখান থেকে বস্তুগত অন্তরাল হটিয়ে দিয়ে চর্মচক্ষু দিয়ে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যেগুলোর ওপর ঈমান বিল গায়েব আনার জন্য

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

আমি ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশনার মাধ্যম করেছিলাম[২] এ তাকীদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজের অভিভাবক করো না।[৩] তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম[৪] এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল। তারপর আমি নিজের কিতাবে[৫] বনী ইস্রাঈলকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দু'বার পৃথিবীতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ভীষণ বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে।[৬]

তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে তাঁদের মর্যাদা একজন দার্শনিকের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। দার্শনিক যা কিছু বলেন, আন্দাজ–অনুমান থেকে বলেন। তিনি নিজে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানলে কখনো নিজের কোন মতের পক্ষে সাক্ষ দেবেন না। কিন্তু নবীগণ যাকিছু বলেন, সরাসরি জ্ঞান ও চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে বলেন। কাজেই তাঁরা জনগণের সামনে এ মর্মে সাক্ষ দিতে পারেন যে, তাঁরা এসব কথা জানেন এবং এসব কিছু তাঁদের স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্যান্ত সত্য।

২. মাত্র একটি আয়াতে মি'রাজের কথা আলোচনা করে তারপর হঠাৎ বনী ইস্রাঈলের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এটা যেন কেমন বেখাপ্পা মনে হবে। কিন্তু সূরার মূল বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করলে এ বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সংযোগ পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাবে। সূরার মূল বক্তব্য হচ্ছে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা। যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাদের এ মর্মে জানিয়ে দেবার জন্য শুরুতে শুধুমাত্র এ কারণে মি'রাজের আলোচনা করা হয়েছে যে, একথাগুলো এমন এক ব্যক্তি বলছেন যিনি এইমাত্র মহান আল্লাহর বিরাট মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখে আসছেন। এরপর বনী ইস্রাঈলের ইতিহাস থেকে এ মর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব লাভকারীরা যখন আল্লাহর মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তখন দেখো তাদেরকে কেমন ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হয়।

৩. অভিভাবক অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার ওপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় যার হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়।

৪. অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই প্লাবনের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৫. কিতাব মানে এখানে তাওরাত নয় বরং আসমানী সহীফাসমূহের সমষ্টি। কুরআনে এ জন্য পারিভাষিক শব্দ হিসেবে "আল কিতাব" কয়েক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. পবিত্র গ্রন্থাদির সমষ্টি বাইবেলে এ সতর্ক বাণী কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রথম বিপর্যয় ও তার অশুভ পরিণতির জন্য বনী ইস্‌রাঈলকে গীতসংহিতা, যিশাইয়র, যিরমিয় ও যিহিষ্কেলে সতর্ক করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় ও তার কঠিন শাস্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ) করেছেন তা মথি ও লূকের ইনজীলে পাওয়া যায়। নিচে আমি এ গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট কথাগুলো উদ্ধৃত করছি। এ থেকে কুরআনের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে।

প্রথম বিপর্যয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তাঁর কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"তাহারা জাতিগুলিকে ধ্বংস করিল না, যাহা সদাপ্রভু করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা জাতিগুলির সহিত মিশিয়া গেল, উহাদের কার্যকলাপ শিখিল। আর উহাদের প্রতিমার পূজা করিল, তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল, ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে আর আপনাদের কন্যাদিগকে শয়তানদের উদ্দেশ্যে বলিদান করিল। তাহারা নির্দোষদের রক্তপাত, তথা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদেরই রক্তপাত করিল, কেনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলিদান করিল; দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল। এই রূপে তাহারা আপনাদের কার্যে অশুচি, আপনাদের ক্রিয়ায় ব্যভিচারী হইল। তাহাতে আপন প্রজাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের শত্রুরা তাহাদের শাসক হইয়া গেল।" [গীতসংহিতা ১০৬ ঃ ৩৪-৪১]

যেসব ঘটনা পরে ঘটতে যাচ্ছিল এ বাক্যগুলোয় সেগুলোকে অতীত কালের ক্রিয়াপদে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো যেন ঘটে গেছে। এটি হচ্ছে আসমানী কিতাবের একটি বিশেষ বর্ণনারীতি।

তারপর যখন এ বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে গেল তখন এর ফলে যে ধ্বংস সংঘটিত হলো হযরত ইয়াসঈয়াহ নবী নিজের সহীফায় তার খবর এভাবে দিচ্ছেনঃ

"আহা, পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ; তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইসরাঈলের পবিত্রাত্মাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরান্মুখ হইয়াছে। তোমরা আর কেন প্রহৃত হইবে? হইলে অধিক বিদ্রোহাচরণ করিবে।" [যিশইয় ১ঃ ৪-৫]

"সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে। সে তো ন্যায় বিচারে পূর্ণা ছিল। ধার্মিকরা তাহাতে বাস করিত, কিন্তু এখন হত্যাকারী লোকেরা থাকে .... তোমার সরদাররা

বিদ্রোহী ও চোরদের সখা ; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভালবাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন করে; তাহার পিতৃহীন লোকের প্রতি ইনসাফ করে না, এবং বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকট আসিতে পায় না। এজন্য প্রভু বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরাঈলের এক বীর কহেন, আহা, আমি আপন বিপক্ষদিগকে (দণ্ড দিয়া) শান্তি পাইব, ও আমার শত্রুদের নিকট হইতে প্রতিশোধ নিব।" [যিশাইয় ১ঃ ২১–২৪]

"তাহারা পূর্বদেশের প্রথায় পরিপূর্ণ ও পলেস্টীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, এবং বিজাতীয় সন্তানদের হস্তে হস্ত দিয়াছে।............আর তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপনাদের হস্ত নির্মিত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে, তাহাত তাহাদেরই অংগুলি দ্বারা নির্মিত।" [যিশাইয় ২ ঃ ৬–৮]

"সদাপ্রভু আরো বলিলেন, সিয়োনের কন্যাগণ গর্বিতা, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘুপদ সঞ্চারে চলে, ও চরণে রুনু রুনু শব্দ করে। অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাক পড়া করিবেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্যস্থান অনাবৃত করিবেন।..........তোমার পুরুষেরা খড়গ দ্বারা, ও তোমার বিক্রমীগণ সংগ্রামে পতিত হইবে। তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; আর সে উৎসন্না হইয়া ভূমিতে বসিবে।" [যিশাইয় ৩ ঃ ১৬–২৬]

"এখন দেখ, প্রভু [ফরাৎ] নদীর প্রবল ও প্রচুর জল, অর্থাৎ অশূর–রাজ ও তাহার সমস্ত প্রতাপকে, তাহাদের উপরে আনিবেন; সে ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত তীর ভূমির উপর দিয়া যাইবে।" [যিশাইয় ৮ঃ৭]

"কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত। তাহারা দর্শকদিগকে বলে, তোমরা দর্শন করিও না, নবীগণকে বলে, তোমরা আমাদের কাছে সত্য নবুওয়াত প্রকাশ করিও না, আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মিথ্যা নবুওয়াত প্রকাশ কর, পথ হইতে ফির, রাস্তা ছাড়িয়া দাও, ইসরাঈলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূর কর। অতএব ইসরাঈলের পবিত্রতম এই কথা কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয় জ্ঞান করিয়াছ, এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপর নির্ভর করিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ, এইহেতু সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতনশীল দেয়ালের ন্যায় হইবে। যাহার ভংগ হঠাৎ মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না; যাহাতে চূলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ হইতে জল তুলিতে একখানা খোলাও পাওয়া যাইবে না।" [৩০ ঃ ৯–১৪]

তারপর যখন বন্যার বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় তখন ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) নবীর আওয়াজ বুলন্দ হয় এবং তিনি বলেন ঃ

"সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে?...........আমি তোমাদিগকে এই ফলবান দেশে আনিয়াছিলাম যেন তোমরা এখানকার ফল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন কর। কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অশুচি করিলে, আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ করিলে।...........বস্তুত দীর্ঘকাল হইল

আমি তোমার যোয়ালি ভগ্ন করিয়াছিলাম, তোমার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম; আর তুমি বলিয়াছিলে, আমি দাসত্ব করিব না; বাস্তবিক সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নত হইয়া ব্যভিচার করিয়া আসিতেছ। (অর্থাৎ প্রত্যেকটি শক্তির সামনে নত হইয়াছ এবং প্রত্যেকটি মূর্তিকে সিজ্‌দা করিয়াছ)।...........চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইসরাঈলকুল, আপনারা ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও ভাববাদিগণ লজ্জিত হইয়াছে, বস্তুত তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা, শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী, তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়, কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলিবে, 'তুমি উঠ, আমাদিগকে রক্ষা কর।' কিন্তু তুমি আপনার জন্য যাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠুক, যদি বিপদকালে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে; কেননা হে যিহূদা! তোমার যত নগর তত দেবতা।" [যিরমিয় ২ ঃ ৫-২৮]

"যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইসরাঈল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। সে এই সকল কর্ম করিলে পরে আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল। আর আমি দেখিলাম, বিপথগামিনী ইসরাঈল ব্যভিচার (অর্থাৎ শির্‌ক) করিয়াছিল, এই কারণ প্রযুক্তই যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অশুচি হইয়াছিল ; সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার (অর্থাৎ মূর্তিপূজা) করিত।" [যিরমিয় ৩ ঃ ৬-৯]

"তোমরা জেরুশালেমের সড়কে সড়কে দৌড়াদৌড়ি কর, দেখ, জ্ঞাত হও এবং তথাকার সকল চকে অন্বেষণ কর, যদি এমন একজনকেও পাইতে পার, যে ন্যায়াচরণ করে, সত্যের অনুশীলন করে, তবে আমি নগরকে ক্ষমা করিব।......আমি কিরূপে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করিল, ও দলে দলে বেশ্যার বাটিতে গিয়া একত্র হইল। তাহারা খাদ্যপুষ্ট অশ্বের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেকজন পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করিল। আমি এই সকলের প্রতিফল দিব না, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না?" [যিরমিয় ৫ ঃ ১-৯]

"হে ইসরাঈল কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূর হইতে এক জাতিকে আনিব ; সে বলবান জাতি, সে প্রাচীন জাতি ; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, তাহারা কি বলে তাহা বুঝিতে পার না। তাহাদের তূন খোলা কবরের ন্যায়, তাহারা সকলে বীর পুরুষ। তাহারা তোমার পক্ক শস্য ও তোমার অন্ন, তোমার পুত্রকন্যাগণের খাদ্য গ্রাস করিবে; তাহারা তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে, তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে, তুমি যেসব প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল তাহারা খড়গ দ্বারা চুরমার করিবে।" [যিরমিয় ৫ ঃ ১৫-১৭]

"এই জাতির শব আকাশের পক্ষীসমূহের ও ভূমির পশুগণের ভক্ষ্য হইবে, কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। তখন আমি যিহূদার সকল নগরে ও জেরুশালেমের সকল পথে আমাদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব নিবৃত্ত করিব; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।" [যিরমিয় ৭ ঃ ৩৩–৩৪]

"তুমি আমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বিদায় কর, তাহারা চলিয়া যাউক। আর যদি তাহারা তোমাকে বলে, কোথায় চলিয়া যাইব? তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এইকথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর স্থানে, খড়গের পাত্র খড়গের স্থানে, দুর্ভিক্ষের, পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন করুক।" [যিরমিয় ১৫ ঃ ১–৩]

তারপর যথাসময়ে যিহিষ্কেল নবী উঠেন এবং তিনি জেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলেনঃ

"হে নগরী, তুমি নিজের মধ্যে রক্তপাত করিয়া থাকো, যেন তোমার কাল উপস্থিত হয় ; তুমি নিজের জন্য পুত্তলিগণকে নির্মাণ করিয়া থাকো, যেন তুমি অশুচি হও।.........দেখ, ইসরাঈলের অধ্যক্ষগণ, প্রত্যেক আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে, তোমার মধ্যে রক্তপাত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তোমার মধ্যে পিতামাতাকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে পিতৃহীনের ও বিধবার প্রতি জুলুম করা হইয়াছে। তুমি আমার পবিত্র বস্তুসমূহ অবজ্ঞা করিয়াছ, ও আমার বিশ্রামের দিনগুলিকে অপবিত্র করিয়াছ। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে চোগলখোররা আসিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে কুকর্ম করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে ; তোমার মধ্যে কেহ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ঘৃণার্হ কাজ করিয়াছে; কেহবা আপন পুত্রবধূকে কুকর্মে অশুচি করিয়াছে; আর কেহ বা তোমার মধ্যে আপনার ভগিনীকে, আপন পিতার কন্যাকে বলাৎকার করিয়াছে। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে লোকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে ; তুমি সুদও বৃদ্ধি লইয়াছ, উপদ্রব করিয়া লোভে প্রতিবেশীদের কাছে লাভ করিয়াছ এবং আমাকেই ভুলিয়া গিয়াছ, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।....... তোমার হস্ত কি সবল থাকিবে? আমি সদাপ্রভু ইহা বলিলাম, আর ইহা সিদ্ধ করিব। আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ করিব এবং তোমার মধ্য হইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। তুমি জাতিগণের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রীকৃত হইবে, তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" [যিহিষ্কেল ২২ ঃ ৩–১৬]

প্রথম মহা বিপর্যয়ের সময় বনী ইস্‌রাঈলকে এই হুশিয়ার বাণীগুলো শুনানো হয়। তারপর দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় ও তার ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হবার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করেন। মথি ২৩ অধ্যায়ে তাঁর একটি বিস্তারিত ভাষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে তিনি নিজের জাতির মারাত্মক নৈতিক অধপতনের সমালোচনা করে বলেন ঃ

"হা জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে (নবীগণ) বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন

فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَـٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

শেষ পর্যন্ত যখন এদের মধ্য থেকে প্রথম বিদ্রোহের সময়টি এলো তখন হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের মোকাবিলায় নিজের এমন একদল বান্দার আবির্ভাব ঘটালাম, যারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পূর্ণ হওয়াই ছিল অবধারিত।[৭]

আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন পড়িয়া রহিল।" [২৩ ঃ ৩৭–৩৮]

"আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপর থাকিবে না, সমস্তই ভূমিস্মাৎ হইবে।" [মথি ২৪ ঃ ২]

তারপর রোমান সরকারের কর্মকর্তারা তাঁকে শূলে চড়াবার (তাদের কথা মতো) জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এবং নারীসহ বিপুল সংখ্যক জনতা বিলাপ করতে করতে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিল তখন তিনি শেষবার জনতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"ওগো জেরুশালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিওনা, বরং আপনাদের ও আপন আপন সন্তান সন্তুতিদের জন্য কাঁদ। কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময় লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রী লোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনো দুগ্ধ দেয় নাই। সেই সময় লোকেরা পর্বতগণকে বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ।" [লুক ২৩ ঃ ২৮–৩০]

৭. এখানে আসিরীয়াবাসী ও ব্যবিলনবাসীদের হাতে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল সে কথাই বলা হয়েছে। এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য ওপরে আমি নবীগণের সহীফাসমূহ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছি শুধুমাত্র সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়, বরং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনারও প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যেসব কারণে মহান আল্লাহ একটি কিতাবধারী জাতিকে মানব জাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে একটি পরাজিত, গোলাম ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেই মূল কারণগুলো একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের পর বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করতো। হিত্তী, আম্মাত্তরী, কান্‌আনী, ফিরিয্‌যী, ইয়াবূসী, ফিলিস্তী ইত্যাদি। এসব জাতি মারাত্মক ধরনের শির্‌কে লিপ্ত ছিল। এদের সবচেয়ে বড় মাবুদের নাম ছিল "ঈল"। একে তারা বলতো দেবতাগণের পিতা। আর সাধারণত তারা একে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল "আশীরাহ"। তার গর্ভজাত সন্তানদের থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীদের একটি বিশাল বংশধারা শুরু হয়। এ সন্তানদের সংখ্যা ৭০–এ গিয়ে পৌঁছেছিল। তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বা'ল। তাকে বৃষ্টি ও উৎপাদনের ঈশ্বর এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মনে করা হতো। উত্তরাঞ্চলে তার স্ত্রীকে 'উনাস' বলা হতো এবং ফিলিস্তীনে বলা হতো 'ইস্‌তারাত'। এ মহিলাদ্বয় ছিল প্রেম ও সন্তান উৎপাদনের দেবী। এরা ছাড়া আরো যেসব দেবতা ছিল তাদের মধ্যে কেউ ছিল মৃত্যুর দেবতা, কেউ ছিল স্বাস্থ্যের দেবী আবার কোন দেবতা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব ঘটাতো এভাবে সমগ্র প্রভুত্বের কাজ কারবার বহু সংখ্যক উপাস্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব দেব–দেবীকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল যে, সমাজের নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুরাচার ব্যক্তিও তাদের সাথে নিজের নাম জড়িত করে লোকসমক্ষে পরিচিতি লাভ করা পছন্দ করতো না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা এ ধরনের বদ ও নিকৃষ্ট সত্তাদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পূজা–উপাসনা করে, তারা নৈতিকতার নিকৃষ্টস্তরে নেমে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে কেমন করে রক্ষা করতে পারে। এ কারণেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করার পর তাদের অবস্থার যে চিত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তা তাদের মারাত্মক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ দিচ্ছে। শিশু বলিদানের ব্যাপারটি তাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাদের উপাসনালয়গুলো ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। মেয়েদেরকে দেবদাসী বানিয়ে উপাসনালয়গুলোতে রাখা এবং তাদের দিয়ে ব্যভিচার করানো ইবাদত ও উপাসনার অংগে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু চরিত্র বিধ্বংসী কাজ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাওরাতে হযরত মূসার (আ) সাহায্যে বনী ইসরাঈলকে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা ঐ সব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের সাথে বসবাস করা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের নৈতিক ও আকীদা–বিশ্বাসগত দোষ–ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করলো তখন তারা একথা ভুলে গেলো। তারা নিজেদের কোন সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলো না। গোত্র প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষে তারা মত্ত হয়ে গেলো। তাদের বিভিন্ন গোত্র বিজিত এলাকার এক একটি অংশ নিয়ে নিজের এক একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করাই পছন্দ করলো। এ বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের কোন একটি গোত্রও নিজের এলাকা থেকে মুশরিকদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাটাই তাদের পছন্দ করে নিতে হলো। শুধু এ নয় বরং তাদের বিজিত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঐ সব মুশরিক জাতির ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রও অক্ষুণ্ণ থাকলো। বনী ইস্‌রাঈলরা সেগুলো জয় করতে পারলো না। যাবুরের (গীতসংহিতা) বক্তব্যে এরই অভিযোগ করা হয়েছে। এই সূরার ৬ টীকার শুরুতে আমি এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

হযরত মূসার (আ) পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইসরাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইসরাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামঊন, বনু দান, বনু বিন্‌ইয়াসিন, বনু আফরায়াম, বনু রুবন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাস্‌সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের —এ গোত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল: আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দুয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, রোমক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হইত—যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।
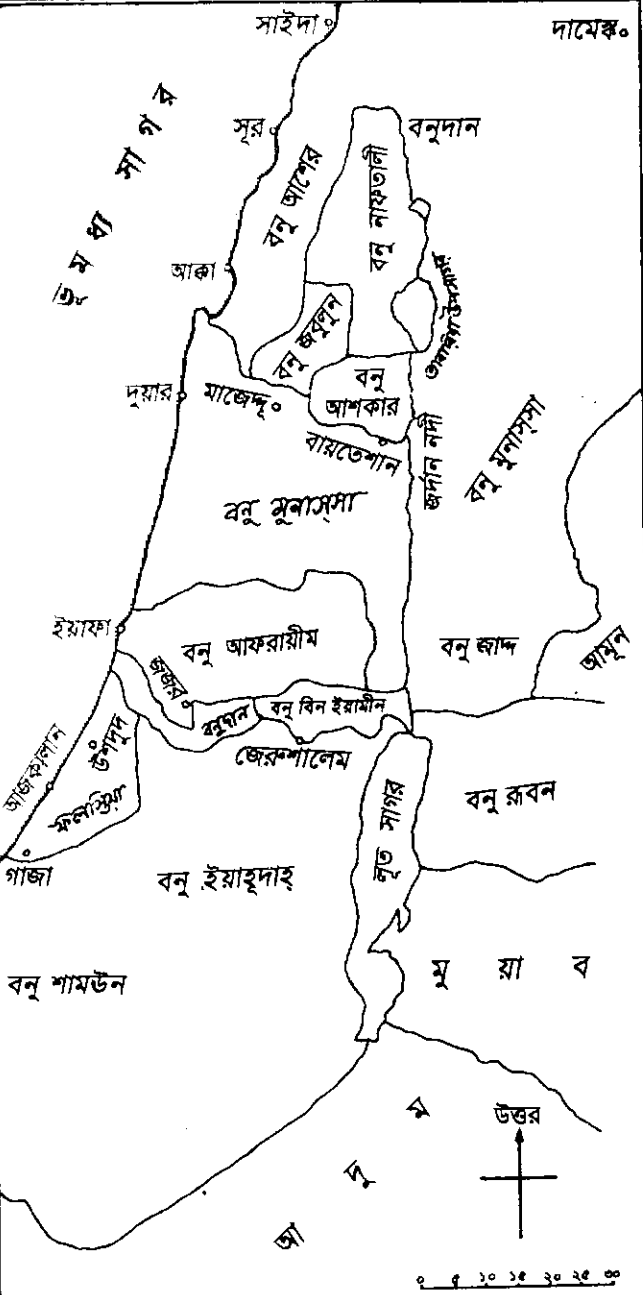
হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন

বনী ইস্‌রাঈলকে এর প্রথম দণ্ড ভোগ করতে হলো এভাবে যে, ঐ জাতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে শির্‌ক অনুপ্রবেশ করলো এবং এ সাথে অন্যান্য নৈতিক অনাচারও ধীরে ধীরে প্রবেশ করার পথ পেয়ে গেলো। বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এ সম্পর্কে এভাবে অনুযোগ করা হয়েছে ঃ

"ইস্‌রাঈল সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করিত। তাহাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১–১৩]

এরপর তাদের দ্বিতীয় দণ্ড ভোগ করতে হলো। সেটি হচ্ছে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্রগুলোকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তীয়রা, যাদের সমগ্র এলাকা অবিজিত রয়ে গিয়েছিল, বনী ইস্‌রাঈলদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করলো এবং লাগাতার হামলা করে ফিলিস্তীনের বৃহত্তম অংশ থেকে তাদেরকে বেদখল করলো। এমনকি তাদের কাছ থেকে সদাপ্রভুর অংগীকারের সিন্দুকও (শান্তির তাবুত) ছিনিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত বনী ইস্‌রাঈলরা অনুভব করলো, তাদের একজন শাসকের অধীনে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শামুয়েল নবী ১০২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তালূতকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। (সূরা বাকারার ৩২ রুকূতে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এ সংযুক্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়েছিলেন তিনজন। খৃঃপূ ঃ ১০২০ থেকে ১০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তালূত, খৃঃ পূঃ ১০০৪ থেকে ৯৬৫ সাল পর্যন্ত হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং খৃঃ পূঃ ৯৬৫ থেকে ৯২৬ সাল পর্যন্ত হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাঈলরা যে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিল এ শাসনকর্তাগণ সেটি সম্পূর্ণ করেন। শুধুমাত্র উত্তর উপকূলে ফিনিকিয়দের এবং দক্ষিণ উপকূলে ফিলিস্তীয়দের রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থেকে যায়। এ রাষ্ট্র দু'টি জয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে এদেরকে শুধু করদ রাষ্ট্রে পরিণত করেই ক্ষান্ত হতে হয়।

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈল আবার ভীষণভাবে দুনিয়াদারী ও বৈষয়িক স্বার্থপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেদের দু'টো পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। উত্তর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈল রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত সামেরীয়া এর রাজধানী হলো। অন্যদিকে দক্ষিণ ফিলিস্তীন ও আদোন অঞ্চলে কায়েম হলো ইহুদিয়া রাষ্ট্র। জেরুশালেম হলো এর রাজধানী। প্রথম দিন থেকেই এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো মারাত্মক ধরনের রেষারেষি ও সংঘাত–সংঘর্ষ এবং শেষ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো।

এদের মধ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের শাসক ও বাসিন্দারাই সর্বপ্রথম প্রতিবেশী জাতিদের মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলো। এ রাষ্ট্রের শাসক

আখীয়াব সাইদার মুশরিক শাহজাদী ইসাবেলাকে বিয়ে করার পর এ দুরাবস্থা চরমে পৌঁছে গেলো। এ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উপায়–উপকরণের মাধ্যমে শির্‌ক ও নৈতিক অনাচার বন্যার বেগে ইস্‌রাঈলীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। হযরত ইলিয়াস ও হযরত আল–ইয়াসা' আলাইহিমাস্‌ সালাম এ বন্যা রুখে দেবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু এ জাতি যে অনিবার্য পতনের দিকে ছুটে চলছিল তা থেকে আর নিবৃত্ত হলো না। শেষে আশূরীয় বিজেতাদের আকারে আল্লাহর গযব ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে এলো এবং খৃষ্টপূর্ব নবম শতক থেকে ফিলিস্তীনের ওপর আশূরীয় শাসকদের উপর্যুপরি হামলা শুরু হয়ে গেলো। এ যুগে আমূস (আমোস্‌) নবী (খৃঃ পূঃ ৭৮৭–৭৪৭) এবং তারপর হোসী' (হোশেয়) নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭৪৭–৭৩৫) ইসরাঈলীদেরকে অনবরত সতর্ক করে যেতে থাকলেন। কিন্তু যে গাফলতির নেশায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল সতর্কবাণীর তিক্ত রসে তার তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। এমন কি ইসরাঈলী বাদশাহ আমূস নবীকে দেশত্যাগ করার এবং সামেরীয় রাজের এলাকার চতুঃসীমার মধ্যে তাঁর নবুওয়াতের প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আর বেশীদিন যেতে না যেতেই ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্র ও তার বাসিন্দাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এলো। খৃষ্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আশূরীয়ার দুর্ধর্ষ শাসক সারাগুন সামেরীয়া জয় করে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটালো। হাজার হাজার ইস্‌রাঈলী নিহত হলো। ২৭ হাজারেরও বেশী প্রতিপত্তিশালী ইসরাঈলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে আশূরীয় রাষ্টের পূর্ব প্রান্তের জেলাসমূহে ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং অন্যান্য এলাকা থেকে অইস্‌রাঈলীদেরকে এনে ইসরাঈলী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হলো। এদের মধ্যে বসবাস করে ইস্‌রাঈলীদের দলছুট অংশও নিজেদের জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে দিনের পর দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো।

ইহুদীয়া নামে বনী ইস্‌রাঈলদের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি দক্ষিণ ফিলিস্তীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর অতি শীঘ্রই শির্‌ক ও নৈতিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের তুলনায় তার আকীদাগত এবং নৈতিক অধপতনের গতি ছিল মন্থর। তাই তার অবকাশকালও ছিল একটু বেশী দীর্ঘ। ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের মত তার ওপরও আশূরীয়রা যদিও উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, তার নগরগুলো ধ্বংস করে চলছিল এবং তার রাজধানী অবরোধ করে রেখেছিল, তবুও এ রাজ্যটি আশূরীয়দের হাতে পুরোপুরি বিজিত হয়নি, বরং এটি তাদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর যখন হযরত ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও হযরত ইয়ারমিয়াহর (যিরমিয়) অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইয়াহুদিয়ার লোকেরা মূর্তি পূজা ও নৈতিক অনাচার ত্যাগ করলো না তখন খৃষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নসর জেরুশালেমসহ সমগ্র ইয়াহুদিয়া রাজ্য জয় করে নিল এবং ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ তার হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো। ইহুদীদের অপকর্মের ধারা এখানেই শেষ হলো না। হযরত ইয়ারমিয়াহর হাজার বুঝানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের চরিত্র কর্ম সংশোধন করার পরিবর্তে ব্যবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে ৫৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বখ্‌তে নসর একটি বড় আকারের হামলা চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোট বড় সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল এবং জেরুশালেম ও হাইকেলে সুলায়মানীকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করলো যে, তার একটি দেয়ালও অক্ষত রইলো না, সবকিছু ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে বিভিন্ন দেশে

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে সাহায্য করেছি অর্থ ও সন্তানের সাহায্যে আর তোমাদের সংখ্যা আগের চাইতে বাড়িয়ে দিয়েছি।[৮]

বিতাড়িত করলো। আর যেসব ইহুদী নিজেদের এলাকায় থেকে গেলো তারাও প্রতিবেশী জাতিদের পদতলে নিকৃষ্টভাবে দলিত মথিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকলো।

এটিই ছিল প্রথম বিপর্যয়। বনী ইসরাঈলকে এ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। আর এটিই ছিল প্রথম শাস্তি। এ অপরাধে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

৮. এখানে ইহুদীদেরকে (ইয়াহুদিয়াবাসী) ব্যবিলনের দাসত্বমুক্ত হবার পর যে অবকাশ দেয়া হয় সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সামেরীয়া ও ইস্‌রাঈলের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, আকীদাগত ও নৈতিক পতনের গর্তে পা দেবার পর তারা আর সেখান থেকে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুকৃতি ও কল্যাণের দাওয়াত দিয়ে আসছিল। তারা ইয়াহুদিয়ায় যেসব ইহুদী থেকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ করতে থাকলো এবং ব্যবিলন ও অন্যান্য এলাকায় যাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদেরকেও তাওবা ও অনুশোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত তাদের সহায়ক হলো। ব্যবিলন রাষ্ট্রের পতন হলো। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইরানী বিজেতা সাইরাস (খুরস বা খসরু) ব্যবিলন জয় করে এবং তারপরের বছরই এক ফরমান জারী করে। এ ফরমানের সাহায্যে বনী ইস্‌রাঈলকে নিজেদের স্বদেশভূমিতে ফিরে যাবার এবং সেখানে পুনরায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ইয়াহুদিয়ার দিকে ইহুদীদের কাফেলার সারি চলতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর সিলসিলা অব্যাহত থাকে। সাইরাস ইহুদীদেরকে হাইকেলে সুলাইমানী পুনর্বার নির্মাণ করারও অনুমতি দেয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ এলাকায় নতুন বসতিকারী প্রতিবেশী জাতিগুলো এতে বাধা দিতে থাকে। শেষে প্রথম দারায়ুস (দারা) ৫২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইয়াহুদিয়ার শেষ বাদশাহর নাতি সরুব্বাবিলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী (হগয়) নবী, যাকারিয়া (সখরিয়) নবী ও প্রধান পুরোহিত যেশূয়ের তত্বাবধানে পবিত্র হাইকেল পুনরনির্মাণ করে। তারপর খৃষ্টপূর্ব ৪৫৮ সালে হযরত উযাইর (ইয্রা) ইয়াহুদিয়ায় পৌছেন। পারস্যরাজ ইর্‌দশীর এক ফরমান বলে তাঁকে এ মর্মে ক্ষমতা দান করেন ঃ

"হে উযাইর তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে, তদনুসারে নদী পারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য, যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্তা ও বিচারকর্তাদিগকে নিযুক্ত কর ; এবং যে তাহা না জানে, তোমরা তাহাকে শিক্ষা দাও। আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন
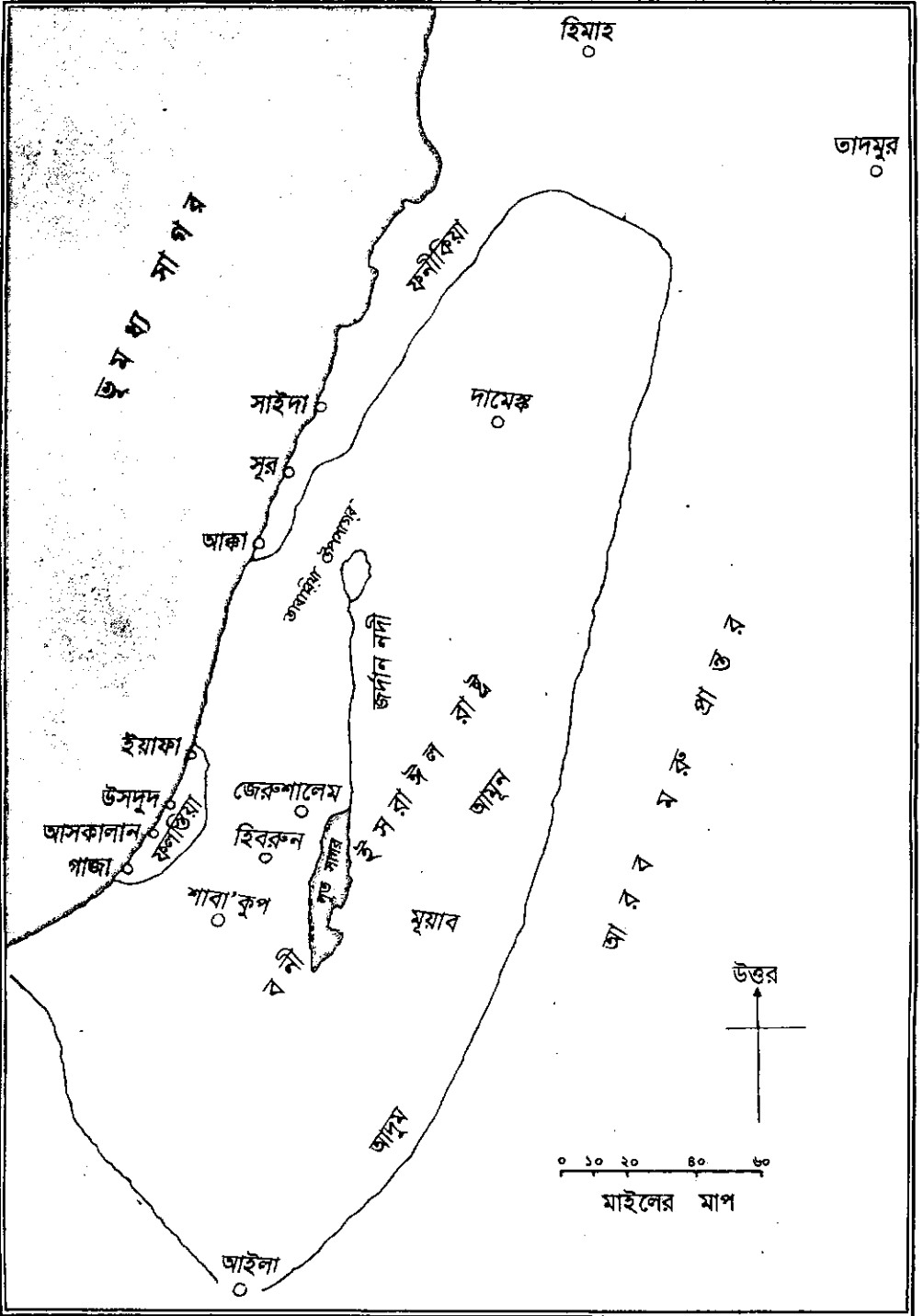
হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সাম্রাজ্য (১০০০–৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)
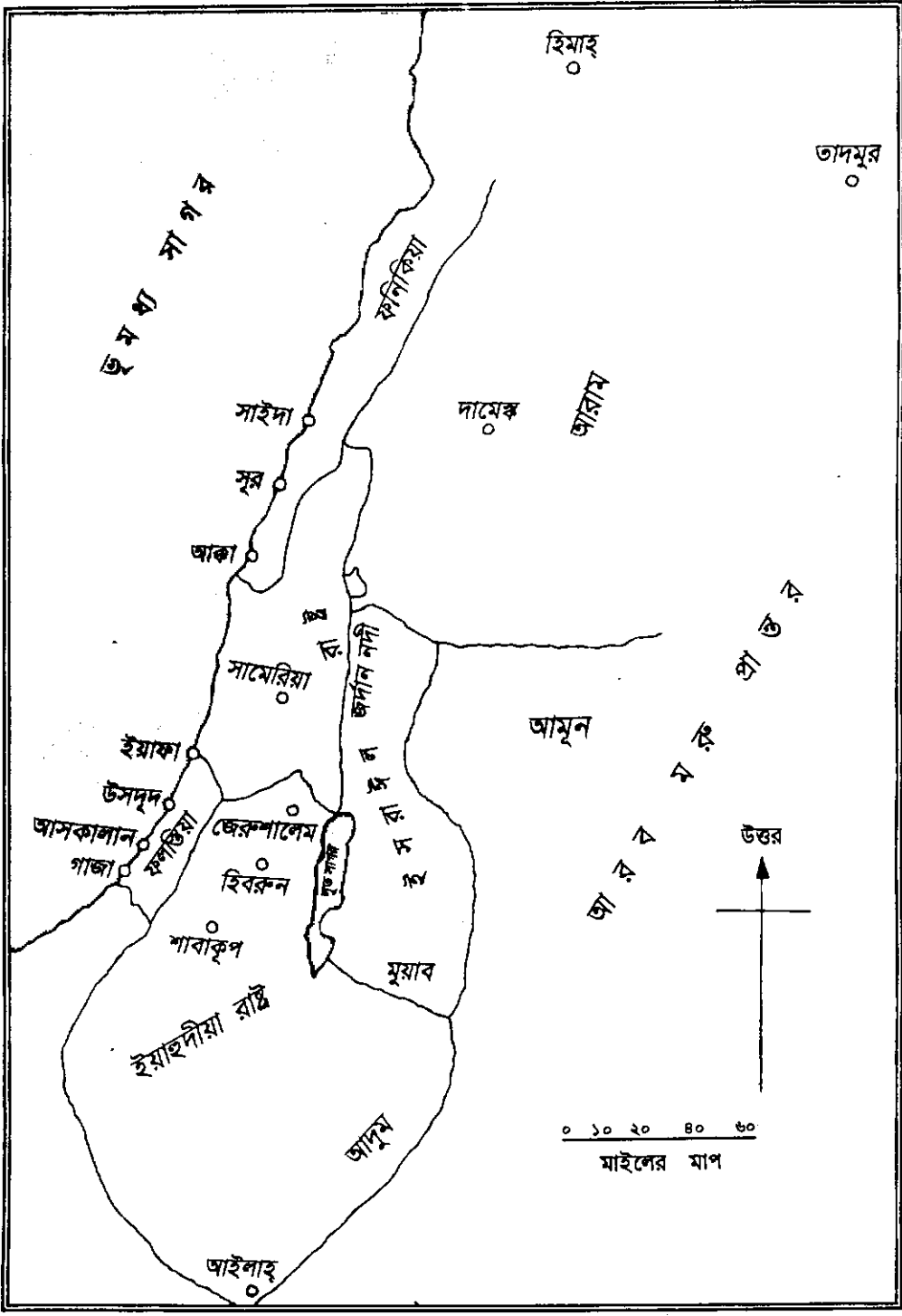
বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃষ্টপূর্ব ৮৬০)

করিতে অসম্মত তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হউক ; তাহার প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিম্বা কারাদণ্ড হউক।" [ইস্রা ৭ ঃ ২৫–২৬]

এ ফরমানের সুযোগ গ্রহণ করে হযরত উযাইর মূসার দীনের পুনরুজ্জীবনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ইহুদী জাতির সকল সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোককে একত্র করে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাওরাত সম্বলিত বাইবেলের পঞ্চ পুস্তক একত্র সংকলিত ও বিন্যস্ত করে তিনি তা প্রকাশ করেন। ইহুদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্য জাতিদের প্রভাবে বনী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে যেসব আকীদাগত ও চারিত্রিক অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শরীয়াতের আইন জারী করে তিনি সেগুলো দূর করে দিতে থাকেন। ইহুদীরা যেসব মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করে তাদেরকে নিয়ে ঘর সংসার করছিল তাদেরকে তালাক দেবার ব্যবস্থা করেন। বনী ইস্‌রাঈলদের থেকে আবার নতুন করে আল্লাহর বন্দেগী করার এবং তাঁর আইন মেনে চলার অংগীকার নেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে নহিমিয়ের নেতৃত্বে আর একটি বহিষ্কৃত ইহুদী দল ইয়াহুদিয়ায় ফিরে আসে। পারশ্যের রাজা নহিমিয়কে জেরুশালেমের গভর্নর নিযুক্ত করে তাকে এই নগরীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। এভাবে দেড়শো বছর পরে বায়তুল মাকদিস পুনরায় আবাদ হয় এবং তা ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা–সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সামেরিয়া ও উত্তর ফিলিস্তীনের ইস্‌রাঈলীরা হযরত উযাইরের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন কর্মকাণ্ড থেকে লাভবান হবার কোন সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং বায়তুল মাকদিসের মোকাবিলায় জারযীম পাহাড়ে নিজেদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র নির্মাণ করে তাকে আহলি কিতাবদের কিবলায় পরিণত করার চেষ্টা করে। এভাবে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে।

পারস্য সাম্রাজ্যের পতন এবং আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান ও গ্রীকদের উত্থানের ফলে কিছুকালের জন্য ইহুদীরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সিরিয়ার এলাকা পড়ে সালুকী রাজ্যের অংশে। এর রাজধানী ছিল ইনতাকিয়ায়। এর শাসনকর্তা তৃতীয় এন্টিউকাস খৃষ্টপূর্ব ১৯৮ সালে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। এ গ্রীক বিজেতা ছিল মুশরিক ও নৈতিক চরিত্রহীন। ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা–সংস্কৃতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। এর মোকাবিলা করার জন্য সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। এ সংগে ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এ বাইরের অনুপ্রবেশ ইহুদী জাতির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের একটি দল গ্রীক পোশাক, গ্রীক ভাষা, গ্রীক জীবন যাপন পদ্ধতি ও গ্রীক খেলাধূলা গ্রহণ করে নেয় এবং অন্যদল নিজেদের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে। খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ সালে চতুর্থ এন্টিউকাস (যার উপাধি ছিল এপিফানিস বা আল্লাহর প্রকাশ) সিংহাসনে বসে ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য রাজশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে। বায়তুল মাকদিসের হাইকেলে সে জোরপূর্বক মূর্তি স্থাপন করে এবং সেই মূর্তিকে সিজদা করার জন্য ইহুদীদেরকে বাধ্য করে। ইতিপূর্বে যেখানে কুরবানী করা হতো সেখানে কুরবানী করাও বন্ধ করিয়ে দেয় এবং ইহুদীদেরকে মুশরিকদের কুরবানী করার

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦

দেখো, তোমরা ভাল কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাক্‌দিসের) মসজিদে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।[৯]

জায়গায় কুরবানী করার হুকুম দেয়। যারা নিজেদের ঘরে তাওরাত রাখে অথবা শনিবারের দিনের বিধান মেনে চলে কিংবা নিজেদের শিশু সন্তানদের খত্‌না করায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারী করে। কিন্তু ইহুদীরা এ শক্তি প্রয়োগের সামনে মাথা নত করেনি। তাদের মধ্যে একটি দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনটি "মাক্কাবী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। যদিও এ সংঘাত–সংঘর্ষকালে গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীদের যাবতীয় সহানুভূতি গ্রীকদের পক্ষেই ছিল এবং তারা কার্যত মাক্কাবী বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য ইনতাকিয়ার জালেমদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল তবুও সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে হযরত উযাইরের দীনী কার্যক্রমের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত মাক্কাবীদের সাথে সহযোগিতা করে। এভাবে একদিন তারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে নিজেদের একটি স্বাধীন দীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ রাষ্ট্রটি খৃষ্টপূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ রাষ্ট্রটির সীমানা সম্প্রসারিত হতে হতে ধীরে ধীরে পূর্বতন ইয়াহুদিয়া ও ইসরাঈল রাষ্ট্র দুটির আওতাধীন সমগ্র এলাকার ওপর পরিব্যাপ্ত হয়। বরং ফিলিস্তিয়ার একটি বড় অংশও তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেও এ এলাকাটি বিজিত হয়নি।

কুরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এ ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করে।

৯. এ দ্বিতীয় বিপর্যয়টি এবং এর ঐতিহাসিক শাস্তির পটভূমি নিম্নরূপ ঃ

মাক্কাবীদের আন্দোলন যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দীনী প্রেরণা সহকারে শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। নির্ভেজাল বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও অন্তসারশূন্য লৌকিকতা তার স্থান দখল করে। শেষে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তারা নিজেরাই রোমক বিজেতা পম্পীকে ফিলিস্তীনে আসার জন্য আহবান জানায়। তাই খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সনে
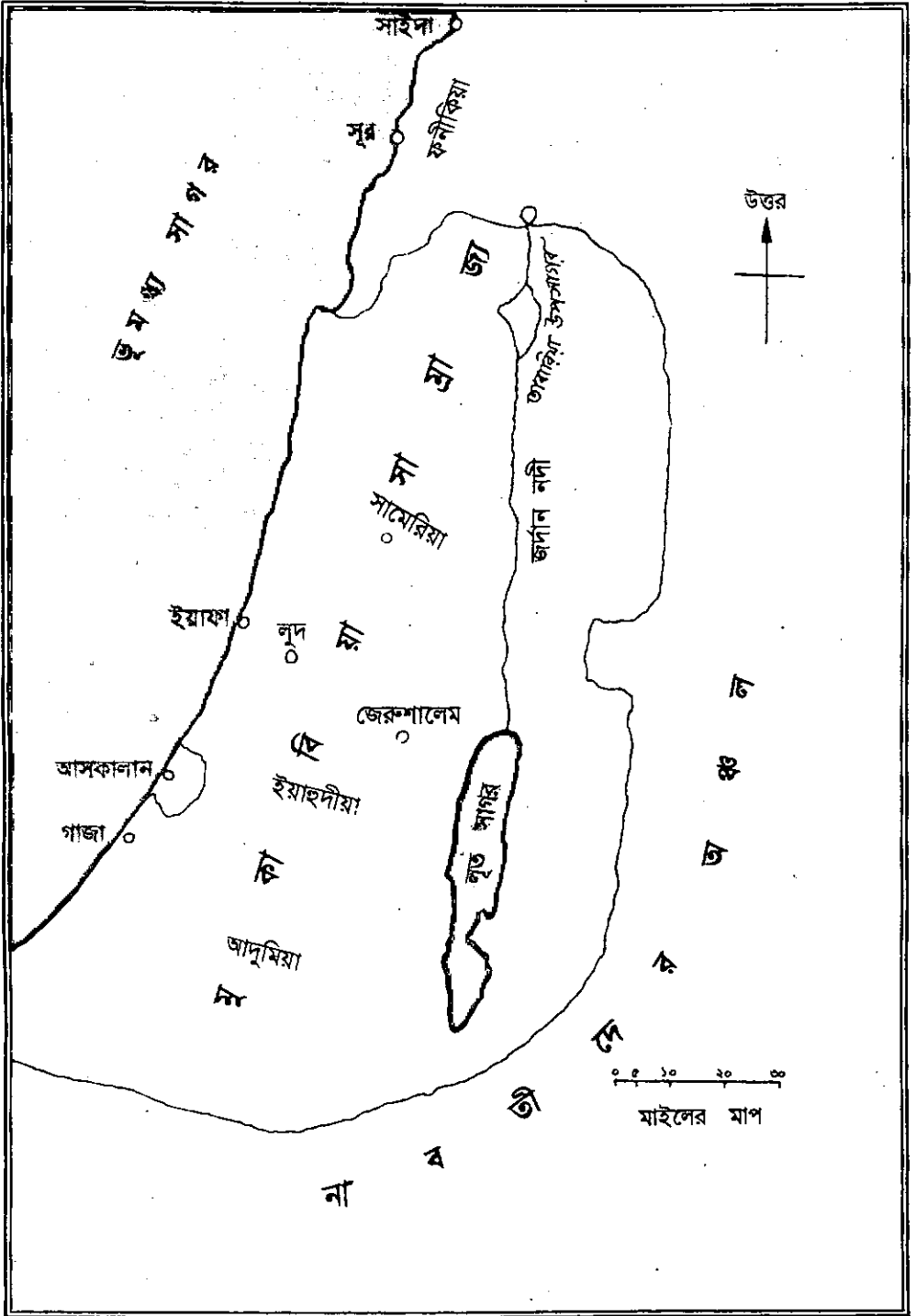
মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন (৯ নং টীকা) (খৃষ্টপূর্ব ১৬৮–৬২)
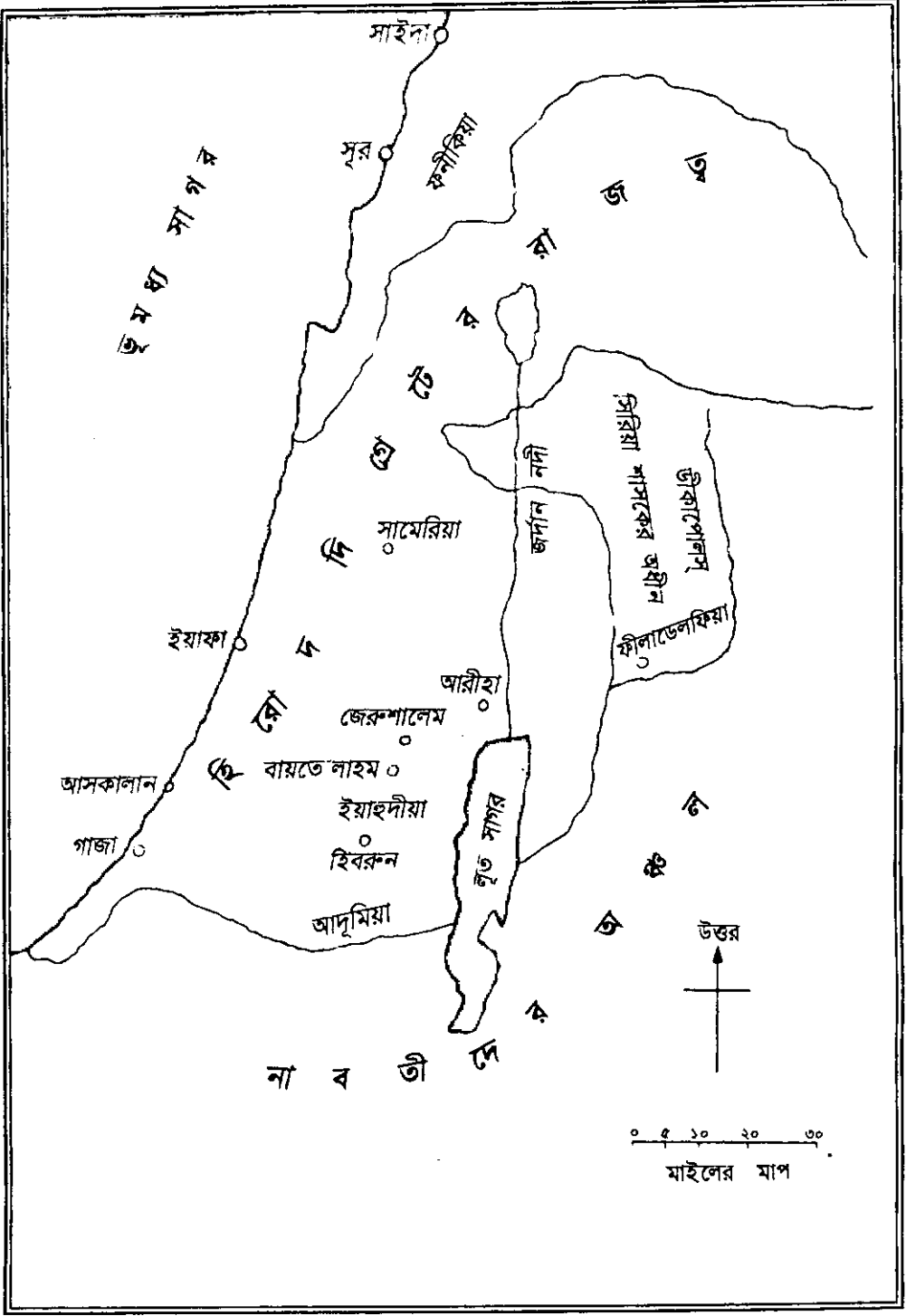
মহান হিরোদ সাম্রাজ্য (খৃষ্টপূর্ব ৪০–৪০)

পম্পী এ দেশের দিকে নজর দেয় এবং বায়তুল মাকদিস জয় করে ইহুদীদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু রোমীয় বিজেতাদের স্থায়ী নীতি ছিল, তারা বিজিত এলাকায় সরাসরি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতো না। বরং স্থানীয় শাসকদের সহায়তায় আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে পরোক্ষভাবে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা বেশী পছন্দ করতো। তাই তারা নিজেদের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তীনে একটি দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। খৃঃপূঃ ৪০ সনে এটি হীরোদ নামক এক সুচতুর ইহুদীর কর্তৃত্বাধীন হয়। ইতিহাসে এ ইহুদী শাসক মহান হীরোদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দান এলাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ৪ সন পর্যন্ত তার শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। একদিকে ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সে ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যদিকে রোমান সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করে রোম সাম্রাজের প্রতি নিজের অত্যধিক বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করে। এভাবে কাইসারের সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এ সময় ইহুদীদের দীনী ও নৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে তার একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়। হীরোদের পর তার রাষ্ট্র তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ

তার এক ছেলে আরখালাউস সামেরীয়া, ইয়াহুদিয়া ও উত্তর উদমিয়ার শাসনকর্তা হয়। কিন্তু ৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট আগস্টাস তাকে পদচ্যুত করে তার কর্তৃত্বাধীন সমগ্র এলাকা নিজের গভর্নরের শাসনাধীনে দিয়ে দেয়। ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই অপরিবর্তিত থাকে। এ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইস্‌রাঈলের সংস্কারের জন্য নবুওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। ইহুদীদের সমস্ত ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতরা একজোট হয়ে তাঁর বিরোধিতা করে এবং রোমান গভর্নর পোন্তিসপীলাতিসের সাহায্যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করার প্রচেষ্টা চালায়।

হীরোদের দ্বিতীয় ছেলে হীরোদ এন্টিপাস উত্তর ফিলিস্তীনের গালীল এলাকা ও ট্রান্স জর্দানের শাসনকর্তা হয়। এ ব্যক্তিই এক নর্তকীর ফরমায়েশে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের শিরশ্ছেদ করে তাকে নযরানা দেয়।

তার তৃতীয় ছেলের নাম ফিলিপ। হারমুন পর্বত থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার অধিকারভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি রোমীয় ও গ্রীক সংস্কৃতিতে নিজের বাপ ও ভাইদের তুলনায় অনেক বেশী ডুবে গিয়েছিল। তার এলাকায় কোন ভাল কথার বা ভাল কাজের বিকশিত হবার তেমন সুযোগ ছিল না যেমন ফিলিস্তীনের অন্যান্য এলাকায় ছিল।

মহামতি হীরোদ তাঁর নিজের শাসনামলে যেসব এলাকার ওপর কর্তৃত্ব করতেন ৪১ খৃষ্টাব্দে তার নাতি হীরোদাগ্রীপ্পাকে রোমীয়রা সেসব এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। এ ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাঁর হাওয়ারীগণ আল্লাহভীতি ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য সে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ সময়ের সাধারণ ইহুদী এবং তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে যেসব ভাষণ দিয়েছেন সেগুলো পাঠ করলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে। চার ইনজীলে এ ভাষণগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।
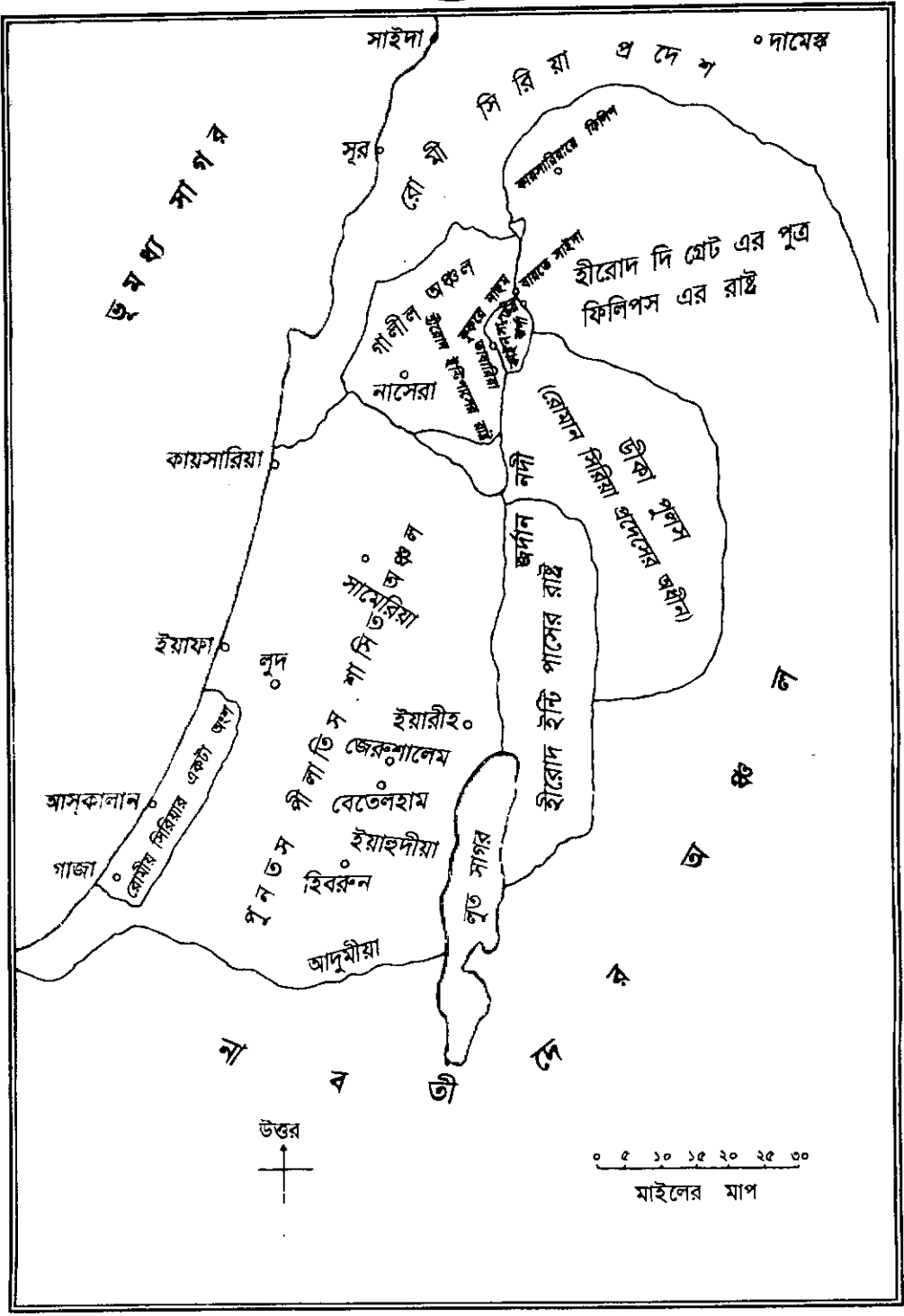
হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

এখন তোমাদের রব তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা আবার নিজেদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও আবার আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো। আর নিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।[১০]

আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভাল কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখেরাত মানে না তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[১১]

তারপর এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এ বিষয়টিও যথেষ্ট যে, এ জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের মতো পুন্যাত্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হলো কিন্তু এ ভয়ংকর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি আওয়াজও শোনা গেলো না। আবার অন্যদিকে সমগ্র জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো কিন্তু হাতে গোনা গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী লোক ছাড়া জাতির এ দুর্ভাগ্যে দুঃখ করার জন্য আর কাউকে পাওয়া গেল না। জাতীয় দুরাবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, পোন্তিসপীলাতিস এ দুর্ভাগ্য পীড়িত লোকদেরকে বললো, আজ তোমাদের ঈদের দিন। প্রচলিত নিয়ম মোতাবিক আজ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের একজনকে মুক্তি দেবার অধিকার আমার আছে। এখন তোমরা বলো, আমি ঈসাকে মুক্তি দেবো, না বারাব্বা ডাকাতকে? সমগ্র জনতা এক কণ্ঠে বললো, বারাব্বা ডাকাতকে মুক্তি দাও। এটা যেন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জাতির গোমরাহীর পক্ষে শেষ প্রমাণ পেশ।

এর কিছুদিন পরেই ইহুদী ও রোমানদের মধ্যে কঠিন সংঘাত–সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। ৬৪ ও ৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। দ্বিতীয় হীরোদাগ্রিপ্পা ও রোম সম্রাট নিযুক্ত প্রাদেশিক দেওয়ান ফ্লোরাস উভয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত রোম সম্রাট বড় ধরনের সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ নির্মূল করলো। ৭০ খৃস্টাব্দে টীটুস সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে জেরুশালেম জয় করলো। এ সময় যে গণহত্যা সংঘটিত হলো তাতে ১ লাখ ৩৩ হাজার লোক মারা

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۞

২ রুকূ'

মানুষ অকল্যাণ কামনা করে সেভাবে—যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই দ্রুতকামী।[১২]

দেখো, আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলোহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং মাস ও বছরের হিসেব জানতে সক্ষম হও। এভাবে আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে আলাদাভাবে পৃথক করে রেখেছি।[১৩]

গেলো। ৬৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে গোলামে পরিণত করা হলো। হাজার হাজার লোককে পাকড়াও করে মিসরের খনির মধ্যে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। হাজার হাজার লোককে ধরে বিভিন্ন শহরে এম্ফী থিয়েটার ও কুসীমুতে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। সেখানে তারা বন্য জন্তুর সাথে লড়াই বা তরবারি যুদ্ধের খেলার শিকার হয়। দীর্ঘাংগী সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজেতাদের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হলো। সবশেষে জেরুশালেম নগরী ও হাইকেলকে বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। এরপর ফিলিস্তীন থেকে ইহুদী কর্তৃত্ব ও প্রভাব এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেলো যে, পরবর্তী দু'হাজার বছর পর্যন্ত ইহুদীরা আর মাথা উঁচু করার সুযোগ পেলো না। জেরুশালেমের পবিত্র হাইকেলও আর কোনদিন নির্মিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে কাইসার হিড্রিয়ান এ নগরীতে পুনরায় জনবসতি স্থাপন করে কিন্তু তখন এর নাম রাখা হয় ইলিয়া। আর এ ইলিয়া নগরীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহুদীদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

দ্বিতীয় মহাবিপর্যয়ের অপরাধে ইহুদীরা এ শাস্তি লাভ করে।

১০. এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, বনী ইস্‌রাঈলদেরকে উদ্দেশ করে এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। সম্বোধন তো করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে বনী ইস্‌রাঈলদের ইতিহাস থেকে কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ সাক্ষ প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল, তাই একটি প্রসংগ কথা হিসেবে বনী ইস্‌রাঈলকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে, যাতে এক বছর পরে মদীনায়

সংস্কারমূলক কার্যাবলী প্রসংগে যেসব ভাষণ দিতে হবে এটি তার ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

১১. মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি বা দল অথবা জাতি এ কুরআনের উপদেশ ও সতর্কবাণীর পর সঠিক পথে না চলে, বনী ইস্রাঈলরা যে শাস্তি ভোগ করেছিল তাদের সেই একই শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

১২. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার যে কথাটি বলছিল যে, ঠিক আছে তোমার সেই আযাব আনো যার ভয় তুমি আমাদের দেখিয়ে থাকো, এ বাক্যটি তাদের সেই নির্বুদ্ধিতাসূলভ কথার জবাব। ওপরের বক্তব্যের পর সাথে সাথেই এ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, নির্বোধের দল, কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে আযাব চাচ্ছো? তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে যে, আল্লাহর আযাব যখন কোন জাতির ওপর নেমে আসে তখন তার দশাটা কী হয়?

এ সংগে এ বাক্যে মুসলমানদের জন্যও একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী ছিল। মুসলমানরা কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন এবং তাদের হঠকারিতায় বিরক্ত ও ধৈর্যহারা হয়ে কখনো কখনো তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার দোয়া করতে থাকতো। অথচ এখনো এ কাফেরদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে ঈমান এনে সারা দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করার মতো বহু লোক ছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন, মানুষ বড়ই ধৈর্যহারা প্রমাণিত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে যে জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হয় মানুষ তাই চেয়ে বসে। অথচ পরে অভিজ্ঞতায় সে নিজেই জানতে পারে যে, সে সময় যদি তার দোয়া কবুল হয়ে যেতো তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হতো না।

১৩. এর অর্থ হচ্ছে, বিরোধ ও বৈষম্যের কারণে ঘাবড়ে গিয়ে সবকিছু সমান ও একাকার করে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে পড়ো না। এ দুনিয়ার সমগ্র কারখানাটাই তো বিরোধ, বৈষম্য ও বৈচিত্রের ভিত্তিতে চলছে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোমাদের সামনে প্রতিদিন এ রাত ও দিনের যাওয়া আসা। দেখো, এদের এ বৈষম্য তোমাদের কত বড় উপকার করছে। যদি তোমরা চিরকাল রাত বা চিরকাল দিনের মধ্যে অবস্থান করতে তাহলে কি এ প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কাজ কারবার চলতে পারতো? কাজেই যেমন তোমরা দেখছো বস্তু জগতের মধ্যে পার্থক্য, বিরোধ ও বৈচিত্রের সাথে অসংখ্য উপকার ও কল্যাণ জড়িত রয়েছে অনুরূপভাবে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও মেজাজ-প্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র পাওয়া যায় তাও বিরাট কল্যাণকর। মহান আল্লাহ তাঁর অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ পার্থক্য ও বৈষম্য খতম করে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক মুমিন ও সৎ বানিয়ে দেবেন অথবা কাফের ও ফাসেকদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়ায় শুধুমাত্র মুমিন ও অনুগত বান্দাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এর মধ্যে কল্যাণ নেই। এ আশা পোষণ করা ঠিক ততটাই ভুল যতটা ভুল শুধুমাত্র সারাক্ষণ দিনের আলো ফুটে থাকার এবং রাতের আঁধার আদৌ বিস্তার লাভ না করার আশা পোষণ করা। তবে যে জিনিসের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হেদায়াতের আলো যাদের কাছে আছে তারা তাকে নিয়ে গোমরাহীর অন্ধকার দূর করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে এবং যখন রাতের মতো কোন অন্ধকারের যুগ শুরু হয়ে যাবে তখন তারা সূর্যের মতো তার পিছু নেবে যতক্ষণ না উজ্জ্বল দিনের আলো ফুটে বের হয়।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ
مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾
مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি[১৪] এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে।– পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়।[১৫] কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[১৬] আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না।[১৭]

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং তার পরিণতির ভাল ও মন্দের কারণগুলো তার আপন সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। নিজের গুণাবলী, চরিত্র ও কর্মধারা এবং বাছাই ও নির্বাচন করার এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সে নিজেই নিজেকে সৌভাগ্যের অধিকারী করে আবার দুর্ভাগ্যেরও অধিকারী করে। নির্বোধ লোকেরা নিজেদের ভাগ্যের ভাল-মন্দের চিহ্নগুলো বাইরে খুঁজে বেড়ায় এবং তারা সব সময় বাইরের কার্যকারণকেই নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাদের ভাল-মন্দের পরোয়ানা তাদের নিজেদের গলায়ই লটকানো থাকে। নিজেদের কার্যক্রমের প্রতি নজর দিলে তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে, যে জিনিসটি তাদেরকে বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, তা ছিল তাদের নিজেদেরই অসৎ গুণাবলী ও অশুভ সিদ্ধান্ত। বাইর থেকে কোন জিনিস এসে জোর পূর্বক তাদের ওপর চেপে বসেনি।

১৫. অর্থাৎ সৎ ও সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা সংশোধন প্রচেষ্টা পরিচালনাকারীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করে না বরং সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। অনুরূপভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে অথবা তার ওপর অনড় থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ, রসূল ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে বাঁচাবার এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা

নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং মানবতার কল্যাণার্থেই চালান। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হচ্ছে, যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে যখন তার সামনে সত্যের সত্য হওয়া এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া সুস্পষ্ট করে দেয়া হয় তখন সে স্বার্থান্ধতা ও অন্ধ আত্মপ্রীতি পরিহার করে সোজা মিথ্যা থেকে সরে দাঁড়াবে এবং সত্যকে মেনে নেবে। অন্ধ আত্মপ্রীতি, হিংসা ও স্বার্থান্ধতার আশ্রয় নিলে সে নিজেই নিজের অশুভাকাংখী হবে।

১৬. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এটি না বুঝা পর্যন্ত মানুষের কার্যধারা কখনো সঠিক নিয়মে চলতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে শরীক নেই। দুনিয়ায় যতই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ, বিপুল সংখ্যক জাতি, গোত্র ও বংশ একটি কাজে বা একটি কর্মপদ্ধতিতে শরীক হোক না কেন, আল্লাহর শেষ আদালতে তাদের এ সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়িত্ব আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার যাকিছু শাস্তি বা পুরস্কার সে লাভ করবে তা হবে তার সেই কর্মের প্রতিদান, যা করার জন্য সে নিজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী বলে প্রমাণিত হবে। এ ইনসাফের তুলাদণ্ডে অন্যের অসৎকর্মের বোঝা একজনের ওপর এবং তার পাপের ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তাই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যেরা কি করছে তা দেখা উচিত নয়। বরং তিনি নিজে কি করছেন সেদিকেই তাঁর সর্বক্ষণ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি থাকে, তাহলে অন্যেরা যাই করুক না কেন সে নিজে সাফল্যের সাথে আল্লাহর সামনে যে কর্মধারার জবাবদিহি করতে পারবে তার ওপরই অবিচল থাকবে।

১৭. এটি আর একটি মৌলিক সত্য। কুরআন বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ সত্যটি মানুষের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর বিচার ব্যবস্থায় নবী এক অতীব মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। নবী এবং তার নিয়ে আসা কর্মসূচীই বান্দার ওপর আল্লাহর দাবী প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে বান্দাকে আযাব দেয়া হবে ইনসাফ বিরোধী। কারণ এ অবস্থায় সে এ ওজর পেশ করতে পারবে যে, তাকে তো জানানোই হয়নি কাজেই কিভাবে তাকে এ পাকড়াও করা হচ্ছে! কিন্তু এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যারা আল্লাহর পাঠানো পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে পাওয়ার পর আবার তা থেকে সরে এসেছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়াবে। নির্বোধরা এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোন নবীর পয়গাম পৌছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অথচ একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার ওপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার ওপর হয়নি।

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ
نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَّن كَانَ
يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ
يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾

যখন আমি কোন জনবসতিকে ধ্বংস করার সংকল্প করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকি, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে আর তখন আযাবের ফায়সালা সেই জনবসতির ওপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই।[১৮] দেখো, কত মানব গোষ্ঠী নূহের পরে আমার হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার রব নিজের বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন এবং তিনি সবকিছু দেখছেন।

যে কেউ আশু লাভের[১৯] আকাংখা করে, তাকে আমি এখানেই যাকিছু দিতে চাই দিয়ে দেই, তারপর তার ভাগে জাহান্নাম লিখে দেই, যার উত্তাপ সে ভুগবে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে।[২০]

১৮. এ আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার সংকল্প মানে এ নয় যে, আল্লাহ এমনিতেই বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার সংকল্প করে নেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে।

মূলত এ আয়াতে যে সত্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, একটি সমাজের সচ্ছল, সম্পদশালী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিকৃতিই শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে। যখন কোন জাতির ধ্বংস আসার সময় হয় তখন তার ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী লোকেরা ফাসেকী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা জুলুম-নির্যাতন ও দুষ্কর্ম-ব্যভিচারে গা ভাসিয়ে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত এ বিপর্যয়টি সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে। কাজেই যে সমাজ নিজেই নিজের ধ্বংসকামী নয় তার ক্ষমতার লাগাম এবং

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا
كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশী হয় এবং সে জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যেমন সে জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সে হয় মুমিন, এ ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রচেষ্টার যথোচিত মর্যাদা দেয়া হবে।[২১] এদেরকেও এবং ওদেরকেও, দু'দলকেই আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপকরণ দিয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে তোমার রবের দান এবং তোমার রবের দান রুখে দেবার কেউ নেই।[২২] কিন্তু দেখো, দুনিয়াতেই আমি একটি দলকে অন্য একটির ওপর কেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি এবং আখেরাতে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশী হবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বও আরো অধিক হবে।[২৩]

আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে মাবুদে পরিণত করো না।[২৪] অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায়–বান্ধব হারা হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক সম্পদের চাবিকাঠি যাতে নীচ ও হীনমনা এবং দুশ্চরিত্র ধনীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখা উচিত।

১৯. আশু লাভের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যে জিনিস দ্রুত পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ একে পারিভাষিক অর্থে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে, অর্থাৎ যার লাভ ও ফলাফল এ দুনিয়ার জীবনেই পাওয়া যায়। এর বিপরীতার্থক পরিভাষা হচ্ছে "আখেরাত", যার লাভ ও ফলাফল মৃত্যু পরবর্তী জীবন পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে।

২০. এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে প্রস্তুত নয় এবং শুধুমাত্র দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সাফল্য ও সমৃদ্ধিকেই নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সে যা কিছু পাবে এ দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে সে কিছুই পেতে পারে না। আর শুধু যে আখেরাতে সে সমৃদ্ধি লাভ করবে না, তা নয়। বরং দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব তার কর্মধারাকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে, যার ফলে সে উল্টা জাহান্নামের অধিকারী হবে।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন ঃ[২৫]

১) তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।[২৬]

২) পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব খুব ভাল করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।[২৭]

২১. অর্থাৎ তার কাজের কদর করা হবে। যেভাবে যতটুকুন প্রচেষ্টা সে আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য করে থাকবে তার ফল সে অবশ্যই পাবে।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকা ও জীবন উপকরণ দুনিয়াদাররাও পাচ্ছে এবং আখেরাতের প্রত্যাশীরাও পাচ্ছে। এসব অন্য কেউ নয়, আল্লাহই দান করছেন। আখেরাতের প্রত্যাশীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দুনিয়া পূজারীদের নেই এবং দুনিয়া পূজারীদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত পৌঁছার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা আখেরাত প্রত্যাশীদেরও নেই।

২৩. অর্থাৎ আখেরাত প্রত্যাশীরা যে দুনিয়া পূজারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী দুনিয়াতেই এ পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পার্থক্য এ দৃষ্টিতে নয় যে, এদের

খাবার–দাবার, পোশাক–পরিচ্ছদ, গাড়ি–বাড়ি ও সভ্যতা–সংস্কৃতির ঠাটবাট ও জৌলুস ওদের চেয়ে বেশী। বরং পার্থক্যটা এখানে যে, এরা যাকিছু পায় সততা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথে পায় আর ওরা যাকিছু লাভ করে জুলুম, নিপীড়ন, ধোঁকা, বেঈমানী এবং নানান হারাম পথ অবলম্বনের কারণে লাভ করে। তার ওপর আবার এরা যাকিছু পায় ভারসাম্যের সাথে খরচ হয়। এ থেকে হকদারদের হক আদায় হয়। এ থেকে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অংশও দেয়া হয়। আবার এ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে অন্যান্য সৎ–কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়া পূজারীরা যাকিছু পায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিলাসিতা, বিভিন্ন হারাম এবং নানান ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে দু' হাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। এভাবে সব দিক দিয়েই আখেরাত প্রত্যাশীদের জীবন আল্লাহভীতি ও পরিচ্ছন্ন নৈতিকতার এমন আদর্শ হয়ে থাকে, যা তালি দেয়া কাপড়ে এবং ঘাস ও খড়ের তৈরী কুঁড়ে ঘরেও এমনই ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করে, যার ফলে এর মোকাবিলায় প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে দুনিয়া পূজারীদের জীবন অন্ধকার মনে হয়। এ কারণেই বড় বড় পরাক্রমশালী বাদশাহ ও ধনাঢ্য আমীরদের জন্যও তাদের সমগোত্রীয় জনগণের হৃদয়ে কখনো নিখাদ ও সাচ্চা মর্যাদাবোধ এবং ভালবাসা ও ভক্তির ভাব জাগেনি। অথচ এর বিপরীতে অভুক্ত, অনাহারী ছিন্ন বস্ত্রধারী, খেজুর পাতার তৈরী কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী আল্লাহ ভীরু মর্দে দরবেশের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে দুনিয়া পূজারীরা নিজেরাই বাধ্য হয়েছে। আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য এ দু' দলের মধ্যে কার ভাগে আসবে এ সুস্পষ্ট আলামতগুলো সেই সত্যটির প্রতি পরিষ্কার ইংগিত করছে।

২৪. এ বাক্যাংশটির অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ তৈরী করে নিয়ো না অথবা অন্য কাউকে ইলাহ গণ্য করো না।

২৫. এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি পেশ করা হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারম্ভ লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন্ ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আন'আমের ১৯ রুকূ' এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হয়।

২৬. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা–উপাসনা করো না বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়াত এ রাজ্যের আইন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝٢٦ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝٢٧ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۗءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝٢٨

৩) আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

৪) বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৫) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।[২৮]

২৭. এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতামাতার। সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপমায়ের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়বে না, বরং তারা নিজেদেরকে বাপমায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়সে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বাপমায়ের খিদমত করা শেখাবে যেমনিভাবে বাপমা শিশুকালে তাদের পরিচর্যা ও লালন পালন এবং মান-অভিমান বরদাশ্‌ত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরি ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপমায়ের জন্য এমনসব শরয়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবে না।

২৮. এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৬) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[২৯] *তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।*[৩০]

অধিকারও আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য–সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করার প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসল লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি–সত্তা ও ধন–সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছে না। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সাদ্‌কার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এ সংগে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকরা স্বতস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায় না সেগুলোও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

২৯. "হাত বাঁধা" একটি রূপককথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া'র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যাংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী

হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন–সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন–দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হেদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইংগিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা–নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম–রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশালী করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশ্‌বুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজো মুসলিম সমাজে রয়েছে। আজো দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজো তাদের চোখে সম্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

৩০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফীর সীমানায় পৌছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোন ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায়–উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোন

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

৭) দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।[৩১]

৮) যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।[৩২]

অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, আচার–আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোন জুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩১. যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়–উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৯) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন,[৩৩] সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৩৪] আর যে ব্যক্তি মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।[৩৫] কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়,[৩৬] তাকে সাহায্য করা হবে।[৩৭]

তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোন ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

৩২. "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবে না বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ–আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

৩৩. "যাকে হত্যা" মানে কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তরভূক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের

প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তরভুক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যত বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক তত বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম করে দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোন অনুপযোগী কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহে আল্লাহ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহর দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন, এটা তো কোনক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

৩৪. পরবর্তীকালে ইসলামী আইন 'সত্য সহকারে হত্যা'কে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এক, জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া। দুই, আল্লাহর সত্যদীনের পথে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তিন, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া, চার, বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। পাঁচ, মুরতাদকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।

৩৫. মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে।

৩৬. হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

৩৭. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফায়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোন ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখে না। বরং এটা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

১০) এতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[৩৮]

১১) প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯]

১২) মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো।[৪০] *এটিই ভাল পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।*[৪১]

১৩) এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল্ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪২]

১৪) যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে। [৪৩]

৩৮. এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিল না। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তারপর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে না রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (যার কোন অভিভাবক নেই আমিই তার অভিভাবক) এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইন একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।

৩৯. এটিও নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিল না। বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতর ভিত্তি প্রস্তর গণ্য করা হয়।

৪০. এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্ত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই। দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

৪২. এ ধারাটির অর্থ হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে "জ্ঞানের" পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজে এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোন দোষারোপ করো না। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতিই স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বশত কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন গুজব ছড়ানোও যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ-অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা, কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করো না। এ নির্দেশটিও ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্দ, গবর্নর ও সিপাহসালারদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۗ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।[৪৪] তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তরভুক্ত।

আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।[৪৫]—কেমন অদ্ভুত কথা, তোমাদের রব তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে কন্যা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন?[৪৬] এটা ভয়ানক মিথ্যা কথা, যা তোমরা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করছো।

ছিঁটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক–পরিচ্ছদ, ঘর–বাড়ি, সওয়ারী ও সাধারণ আচার–আচরণে নম্রতা ও কোমলতা বরং ফকিরী ও দরবেশীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।

৪৪. অর্থাৎ এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোই নিষিদ্ধ সেগুলো করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ।

৪৫. আপাতদৃষ্টে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় মহান আল্লাহ নিজের নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলেন তা আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হয়।

৪৬. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাহ্‌লের ৫৭ থেকে ৫৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো টীকাসহকারে দেখুন।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

আমি এ কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়, কিন্তু তারা সত্য থেকে আরো বেশী দূরে সরে যাচ্ছে। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।[৪৭] পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই।[৪৮] এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না,[৪৯] কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৫০]

৪৭. অর্থাৎ সে নিজেই আরশের মালিক হবার চেষ্টা করতো। কারণ অনেকগুলো সত্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক হলে সেখানে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এক, তারা সবাই হবে প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইলাহ। দুই, তাদের একজন হবে আসল ইলাহ আর বাদবাকি সবাই হবে তার বান্দা এবং সে তাদেরকে নিজের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ সোপর্দ করবে। প্রথম অবস্থাটিতে কোনক্রমেই এসব স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ইলাহর পক্ষে সবসময় সব ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি আনুকূল্য বজায় রেখে এ অনন্ত অসীম বিশ্বলোকের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা এতো পরিপূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য, সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ও সংকল্পের প্রতি পদে পদেই সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। প্রত্যেকেই যখন দেখতো অন্য ইলাহদের সাথে আনুকূল্য ছাড়া তার প্রভুত্ব চলছে না তখন সে একাই সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। আর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, বান্দার সত্তা প্রভুত্বের ক্ষমতা তো দূরের কথা প্রভুত্বের সামান্যতম ভাবকল্প ও স্পর্শ-গন্ধ ধারণ করার ক্ষমতাও রাখে না। য। কোথাও কোন সৃষ্টির দিকে

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

যখন তুমি কুরআন পড়ো তখন আমি তোমার ও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেই এবং তাদের মনের ওপর এমন আবরণ চড়িয়ে দেই যেন তারা কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেই।[৫১]

সামান্যতম প্রভুত্ব কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে দেয়া হতো তাহলে তার পায়া ভারি হয়ে যেতো, আর সামান্য ক্ষণের জন্যও সে বান্দা হয়ে থাকতে রাজী হতো না এবং তখনি সে বিশ্বজাহানের ইলাহ হয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দিতো।

যে বিশ্বজাহানে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি মিলে একসাথে কাজ না করলে গমের একটি দানা এবং ঘাসের একটি পাতা পর্যন্তও উৎপন্ন হতে পারে না তার সম্পর্কে শুধুমাত্র একজন নিরেট মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই একথা চিন্তা করতে পারে যে, একাধিক স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইলাহ তার শাসন কার্য পরিচালনা করছে। অন্যথায় যে ব্যক্তিই এ ব্যবস্থার মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেছে সে এ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে থাকতে পারে না যে, এখানে শুধুমাত্র একজনেরই প্রভুত্ব চলছে এবং তাঁর সাথে অন্য কারোর কোন পর্যায়েই কোন প্রকারের শরীক হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।

৪৮. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজাহান এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, যিনি তাকে পয়দা করেছেন এবং তার লালন পালন ও দেখাশুনা করছেন, তাঁর সত্তা সব রকমের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তাঁর সাথে শরীক ও সহযোগী নয়।

৪৯. প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মানে হচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিস কেবলমাত্র নিজের রবের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত থাকার কথা প্রকাশই করছে না বরং এই সংগে তাঁর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বর্ণনা করছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে একথা বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁরই জন্য আছে।

৫০. অর্থাৎ তোমরা তাঁর সামনে অনবরত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যাচ্ছো এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলছো, এরপরও তিনি ক্ষমা করে চলছেন, রিযিক বন্ধ করছেন না, নিজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতও করছেন না এবং প্রত্যেক ঔদ্ধত্যকারীকে

সংগে সংগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মৃত্যুদণ্ডও দিচ্ছেন না। এসবই তাঁর সহিষ্ণুতা ও অপরূপ ক্ষমাশীলতারই নিদর্শন। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিকেও এবং জাতিকেও বুঝবার ও ভুল সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দিচ্ছেন। তাদেরকে উপদেশ ও সঠিক পথনির্দেশনা দেবার জন্য নবী, সংস্কারক ও প্রচারক পাঠিয়ে চলছেন অনবরত। যে ব্যক্তিই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সোজা পথ অবলম্বন করে তার অতীতের সমস্ত ভুল–ভ্রান্তি মাফ করে দেন।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে মানুষের মনের দরজায় তালা লেগে যায় এবং কুরআন যে দাওয়াত পেশ করে তার কানে তা প্রবেশ করে না। কুরআনের দাওয়াতের মূল কথাই তো হচ্ছে এই যে, দুনিয়াবী জীবনের বাইরের দিকটি দেখে প্রতারিত হয়ো না। এখানে কোন হিসেব ও জবাব গ্রহণকারীর অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও একথা মনে করো না যে, তোমাকে কারোর সামনে নিজের দায়িত্বপালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে যদি কুফরী, শির্‌ক, নাস্তিক্যবাদ, তাওহীদ ইত্যাদি সবরকমের মতবাদ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এর ফলে পার্থিব দৃষ্টিতে কোন বিশেষ ফারাক দেখা দেয় না বলে মনে হয়, তাহলে একথা মনে করো না যে, তাদের কোন আলাদা ও স্থায়ী ফলাফলই নেই। এখানে যদি ফাসেকী ও অনাচারমূলক এবং আনুগত্য ও তাকওয়ার সবরকম কর্মনীতি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং বাস্তবে এদের মধ্য থেকে কোন একটি কর্মনীতির কোন অনিবার্য ফল দেখা না দেয়, তাহলেও একথা মনে করো না যে, আদতে কোন কার্যকর ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নেই। আসলে হিসেব নেয়া ও জবাবদিহি করা সবকিছুই হবে কিন্তু তা হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। একমাত্র তাওহীদের মতবাদ সত্য ও স্থায়ীত্ব লাভকারী এবং বাদবাকি সব মতবাদই বাতিল। কিন্তু তাদের আসল ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা সেখানে প্রকাশিত হবে। একটি অনড় ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নিশ্চয়ই আছে যার দৃষ্টিতে পাপাচার মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর আনুগত্য লাভজনক। কিন্তু সেই আইন অনুযায়ী শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালাও হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। কাজেই তোমরা দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে যেয়ো না এবং এর সন্দেহপূর্ণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করো না। বরং সবশেষে নিজেদের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন রবের সামনে তোমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে সেদিকে নজর রাখো এবং যে সঠিক আকীদাগত ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী তোমাদের আখেরাতের পরীক্ষায় সফলকাম করবে তা অবলম্বন করো।—এ হচ্ছে কুরআনের দাওয়াত। এখন যে ব্যক্তি আদৌ আখেরাতকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয় এবং এ দুনিয়ার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ যাবতীয় বস্তু বিষয়ের মধ্যেই যার সমস্ত আস্থা ও বিশ্বাস সীমাবদ্ধ, সে কখনো কুরআনের এ দাওয়াতকে বিবেচনাযোগ্য মনে করতে পারে না। এ আওয়াজ হামেশা তার কানের পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে, কখনো মনোরাজ্যে প্রবেশ করার পথ পাবে না। এটি একটি মনস্তাত্বিক সত্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মনস্তাত্বিক সত্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আখেরাত মানে না আমি তার অন্তর ও কান কুরআনের দাওয়াতের জন্য বন্ধ করে দিই। অর্থাৎ এটি আমার প্রাকৃতিক আইন। আখেরাত অস্বীকারকারীর ওপর এ আইনটি এভাবে প্রবর্তিত হয়।

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র রবের কথা পড়ো তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৫২] *আমি জানি, যখন তারা কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে তখন আসলে কি শোনে এবং যখন বসে পরস্পর কানাকানি করে তখন কি বলে। এ জালেমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তোমরা এই যে লোকটির পেছনে চলছো এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।*[৫৩] *—দেখো, কী সব কথা এরা তোমার ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে, এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এরা পথ পায় না।*[৫৪]

একথাও মনে থাকা দরকার যে, এটি মক্কার কাফেরদের নিজেদেরই উক্তি ছিল। আল্লাহ তাদের কথাটি তাদের ওপর উল্‌টে দিয়েছেন মাত্র। সূরা 'হা-মীম-সাজদা'য় তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ -(ايات : ٥)

অর্থাৎ "তারা বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো, তার জন্য আমাদের মনের দুয়ার বন্ধ, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।" (আয়াত ঃ ৫)

এখানে তাদের এ উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ বলছেন, এই যে অবস্থাটিকে তোমরা নিজেদের প্রশংসার্হ গুণ মনে করে বর্ণনা করছো, এটিতো আসলে একটি অভিশাপ, তোমাদের আখেরাত অস্বীকৃতির বদৌলতে যথার্থ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী এটি তোমাদের ওপর পড়ছে।

৫২. অর্থাৎ তুমি যে একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব গণ্য করো তাদের তৈরী করা রবদের কোন কথা বলো না, এটা তাদের কাছে বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে। মানুষ কেবল আল্লাহর মন্ত্র জপ করতে থাকবে, বুযর্গদের কার্যকলাপের কোন কথা বলবে না, মাযার, পবিত্রস্থান ইত্যাদির অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যলাভের কোন স্বীকৃতি দেবে না এবং তাদের মতে

وَقَالُوٓا۟ ءَإِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

তারা বলে, "আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করে ওঠানো হবে?"—এদেরকে বলে দাও, "তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চাইতেও বেশী কঠিন কোন জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, "কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে?" জবাবে বলো, "তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের পয়দা করেন।" তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে,[৫৫] "আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে?" তুমি বলে দাও, "অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

যেসব ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগ–বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে কোন প্রশংসা বাণীও নিবেদন করবে না, এ ধরনের 'ওহাবী' আচরণ তাদের একদম পছন্দ নয়। তারা বলে ঃ এ অদ্ভুত ব্যক্তিটির মতে, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, ক্ষমতা ও কুদরতের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতার অধিকারীও একমাত্র আল্লাহ। তাহলে আমাদের এ আস্তানা–মাযারের অধিবাসীদের গুরুত্ব কোথায় রইলো! অথচ তাদের ওখান থেকে আমরা সন্তান পাই, রুগীদের রোগ নিরাময় হয়, ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতি হয় এবং মনের আশা পূর্ণ হয়।

৫৩. মক্কার কাফের সরদাররা পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করতো, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং তারপর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতো। অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, সে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছে। তাই তারা সবাই মিলে তাকে এ বলে বুঝাতো যে, ভাই এ তুমি কার ধোঁকায় পড়ে গেলে? এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ কোন শত্রু এর ওপর যাদু করে দিয়েছে। তাইতো প্ররোচনামূলক কথা বলে চলছে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছ।[৫৬]

৫৪. অর্থাৎ এরা তোমার সম্পর্কে কোন একটি মত প্রকাশ করছে না। বরং বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। কখনো বলছে, তুমি নিজে যাদুকর। কখনো বলছে, তোমাকে কেউ যাদু করেছে। কখনো বলছে, তুমি কবি। কখনো বলছে, তুমি পাগল। এদের যে আসল সত্যের খবর নেই, এদের এসব পরস্পর বিরোধী কথাই তার প্রমাণ। নয়তো প্রতিদিন তারা একটা করে নতুন মত প্রকাশ করার পরিবর্তে কোন একটা চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতো। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, তারা নিজেরা নিজেদের কোন কথায়ও নিশ্চিত নয়। একটি অপবাদ দেয়ার পর নিজেরাই অনুভব করছে, এটা তো ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। তাই পরে আর একটা অপবাদ দিচ্ছে। আবার সেটাকেও খাপ খেতে না দেখে তৃতীয় আর একটা অপবাদ তৈরী করছে। এভাবে তাদের প্রত্যেকটা নতুন অপবাদ পূর্বের অপবাদের প্রতিবাদ করে। এ থেকে জানা যায়, সত্য ও সততার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক শত্রুতা বশত তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যা রচনা করে চলছে।

৫৫. "ইন্‌গাদ" মানে হচ্ছে, ওপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচে থেকে ওপরের দিকে মাথা নাড়া। এভাবে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা হয়।

৫৬. অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্তকার সময়কালটা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা তখন মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ এ কিয়ামতের শোরগোল আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে।

আর "তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে, করতে উঠে আসবে।" একথা বলার মাধ্যমে একটি মহাসত্যের দিকে সূক্ষ্মতম ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন ও কাফের প্রত্যেকের মুখে সে সময় থাকবে আল্লাহর প্রশংসা বাণী। মুমিনের কন্ঠে এ ধ্বনি হবার কারণ, পূর্ববর্তী জীবনে এরি ওপর ছিল তার বিশ্বাস এবং এটিই ছিল তার জপতপ। আর কাফেরের কন্ঠে এ ধ্বনি উচ্চারিত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতিতে এ জিনিসটি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল কিন্তু নিজের বোকামির কারণে সে এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এখন নতুন জীবন লাভ করার সাথে সাথেই সমস্ত কৃত্রিম আবরণ খসে পড়বে এবং তার আসল প্রকৃতির সাক্ষ স্বতস্ফূর্তভাবে তার কন্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে।

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۭ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۭ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٤﴾

৬ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে[৫৭] বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম।[৫৮] আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[৫৯] তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশী জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদের শাস্তি দেন।[৬০] আর হে নবী! আমি তোমাকে লোকদের ওপর হাবিলদার করে পাঠাইনি।[৬১]

৫৭. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে।

৫৮. অর্থাৎ কাফের ও মুশরিক এবং ইসলাম বিরোধীদের সাথে আলাপ–আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ক করার সময় কড়া কথা, বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য বর্জন করবে। বিরোধী পক্ষ যতই অপ্রীতিকর কথা বলুক না কেন মুসলমানদের মুখ থেকে কোন ন্যায় ও সত্য বিরোধী কথা বের হওয়া উচিত নয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাদের আজে বাজে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাণ্ডা মাথায় তাদের এমন সব কথা বলতে হবে, যা যাচাই বাছাই করা, মাপাজোকা, ওজন করা, সত্য এবং তাদের দাওয়াতের মর্যাদার সাথে সংগতিশীল।

৫৯. যখনই তোমরা বিরোধীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে বলে মনে করবে এবং মন–মেজাজ আকস্মিকভাবে আবেগ–উত্তেজনায় ভরে যেতে দেখতে পাবে তখনই তোমাদের বুঝতে হবে, তোমাদের দীনের দাওয়াতের কাজ নষ্ট করার জন্য এটা শয়তানের উস্কানী ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চেষ্টা হচ্ছে, তোমরাও নিজেদের বিরোধীদের মতো সংস্কারের কাজ ত্যাগ করে সে যেভাবে মানব গোষ্ঠীকে বিতর্ক–কলহ ও ফিত্‌না–ফাসাদে মশগুল করে রাখতে চায় সেভাবে তোমরাও তার মধ্যে মশ্‌গুল হয়ে যাও।

৬০. অর্থাৎ আমরা জান্নাতী এবং অমুক ব্যক্তি বা দল জাহান্নামী এ ধরনের দাবী কখনো ঈমানদারদের মুখে উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর–বাইর এবং বর্তমান–ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং কাকে শাস্তি দিতে হবে—এ ফায়সালা তিনিই করবেন। আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে কোন্ ধরনের মানুষ রহমতলাভের অধিকার রাখে এবং কোন্ ধরনের মানুষ শাস্তিলাভের অধিকারী নীতিগত দিক দিয়ে মানুষ অবশ্যি একথা

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর ওপর মর্যাদা দিয়েছি[৬২] এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।[৬৩]

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী) মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না।[৬৪] এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত।[৬৫] আসলে তোমার রবের শাস্তি ভয় করার মতো।

বলার অধিকার রাখে। কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে এবং অমুককে মাফ করে দেয়া হবে, একথা বলার অধিকার কারোর নেই।

সম্ভবত এ উপদেশবাণী এ জন্য করা হয়েছে যে, কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম ও বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হয়ে যেতো যে, তোমরা জাহান্নামে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন।

৬১. অর্থাৎ নবীর কাজ হচ্ছে দাওয়াত দেয়া। লোকদের ভাগ্য নবীর হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি যে, তিনি কারোর ভাগ্যে রহমত এবং কারোর ভাগ্যে শাস্তির ফায়সালা দিয়ে যেতে থাকবেন। এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন ভুল করেছিলেন এবং সে কারণে আল্লাহ তাঁকে এভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বরং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়াই আসল উদ্দেশ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে, নবীই যখন এ মর্যাদার অধিকারী নন তখন তোমরা কিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকেদার হয়ে গেলে?

৬২. এ বাক্যটি আসলে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন সমকালীন লোকদের সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকে ঠিক সেই একই নিয়মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন ও সমগোত্রীয় লোকেরা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব দেখতে পাচ্ছিল না। তারা তাঁকে নিজেদের জনপদের একজন সাধারণ মানুষ মনে করছিল। আর যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তি কয়েক শতাব্দী আগে অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে মনে করতো যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব কেবল তাদের মধ্যেই ছিল। তাই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনে তারা এ বলে আপত্তি জানাতো যে, এ লোকটি তো বেশ লম্ফ ঝম্প মারছে। না জানি নিজেকে কী মনে করে বসেছে। বড় বড় পয়গম্বররা, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সারা দুনিয়ার লোকেরা মানে, তাদের সাথে এ ব্যক্তির কি কোন তুলনাই করা যেতে পারে? আল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বলছেন ঃ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত সৃষ্টি আমার চোখের সামনে আছে। তোমরা জানো না তাদেরকে কোন্ পর্যায়ের এবং কে কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মালিক আমি নিজেই এবং ইতিপূর্বেও আমি বহু নবী পয়দা করেছি যাদের একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন।

৬৩. এখানে বিশেষভাবে দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর দান করার কথা সম্ভবত এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ সাধারণত আল্লাহর কাছ থেকে বেশী দূরে অবস্থান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা যে কারণে তাঁর পয়গম্বরী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করতো তা তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী এ ছিল যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রী–সন্তান ছিল, তিনি পানাহার করতেন, হাটে–বাজারে চলাফেরা করে কেনাবেচা করতেন এবং একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য যেসব কাজ করতো তিনি তা সব করতেন। মক্কার কাফেরদের বক্তব্য ছিল, তুমি একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরা তো হচ্ছে এমন সব লোক, নিজেদের দৈহিক ও মানসিক চাহিদার ব্যাপারে যাদের কোন জ্ঞান থাকে না। তারা তো একটি নির্জন জায়গায় বসে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে ও স্মরণে মশগুল থাকে। ঘর সংসারের চাল–ডালের কথা ভাববার সময় ও মানসিকতা তাদের কোথায়! এর জবাবে বলা হচ্ছে, পুরোপুরি একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার চাইতে বড় দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে, কিন্তু এরপরও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত দান করা হয়েছিল।

৬৪. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কেবল গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা) সিজদা করাই শির্ক নয় বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকাও শির্ক। দোয়া ও সাহায্য চাওয়া ও মূলতাত্বিক বিচারে ইবাদতেরই অন্তরভুক্ত। কাজেই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তি পূজকের সমান অপরাধী। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া কারোরও কোন সামান্যতম ইখতিয়ার নেই। অন্য কেউ কোন আপদ–বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝

আর এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করে দেবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেবো না,[৬৬] আল্লাহর লিখনে এটা লেখা আছে।

আর এদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনসমূহ[৬৭] অস্বীকার করেছে বলেই তো আমি নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রয়েছি। (যেমন দেখে নাও) সামূদকে আমি প্রকাশ্যে উটনী এনে দিলাম এবং তারা তার ওপর জুলুম করলো।[৬৮] আমি নিদর্শন তো এ জন্য পাঠাই যাতে লোকেরা তা দেখে ভয় পায়।[৬৯]

না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস রাখা একটি মুশরিকী বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৫. এ শব্দগুলো নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মাবুদ ও ত্রাণকর্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা বা অতীত যুগের আল্লাহর প্রিয় নেক বান্দা। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ নবী হোক বা আউলিয়া অথবা ফেরেশ্‌তা, কারোই তোমাদের প্রার্থনা শুনার এবং তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তোমরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অসিলায় পরিণত করছো কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং তাঁর বেশী বেশী নিকটবর্তী হবার জন্য অসিলা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ কারোর চিরন্তন স্থায়িত্ব নেই। প্রত্যেকটি জনপদকে হয় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে হয় আর নয়তো আল্লাহর আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস হতে হবে। তোমাদের এ জনপদগুলো চিরকাল এমনি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত থাকবে এই ভুল ধারণা তোমরা কেমন করে পোষণ করতে পারলে?

৬৭. অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মু'জিযা সমূহ, যেগুলো সংঘটিত করা বা পাঠানো হয় নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে। মক্কার কাফেররা বারবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর দাবী জানিয়ে আসছিল।

৬৮. এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মু'জিযা দেখার পর যখন লোকেরা একে মিথ্যা বলতে থাকে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন এ জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। মানব জাতির অতীত

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

স্মরণ করো হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, তোমার রব এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন।[৭০] আর এই যা কিছু এখনই আমি তোমাকে দেখিয়েছি[৭১] একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত গাছকে[৭২] আমি এদের জন্য একটি ফিতনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি।[৭৩] আমি এদেরকে অনবরত সতর্ক করে যাচ্ছি কিন্তু প্রতিটি সতর্কসংকেত এদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে চলছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে, বিভিন্ন জাতি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে নেবার পরও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এটা পুরোপুরি আল্লাহর রহমত যে, তিনি এমন ধরনের কোন মু'জিযা আর পাঠাচ্ছেন না। এর মানে হচ্ছে, তিনি তোমাদের বুঝবার ও সংশোধিত হবার অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, মু'জিযার দাবী জানিয়ে সামূদ জাতির পরিণাম ভোগ করতে চাচ্ছো।

৬৯. অর্থাৎ কোন ম্যাজিক বা দর্শনীয় খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে কখনো মু'জিযা দেখানো হয় না। সব সময় মু'জিযা এই উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, লোকেরা তা দেখে সাবধান হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে নবীর পেছনে আছে এক সর্বময় শক্তিশালী সত্তার অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর নাফরমানীর পরিণাম কি হতে পারে তাও তারা জানতে পারবে।

৭০. অর্থাৎ তোমার নবুওয়াতী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যখন মক্কার এ কাফেররা তোমার বিরোধিতা করতে এবং তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে শুরু করেছিল তখনই আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আমি এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছি, এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, কোনভাবেই এরা তোমার দাওয়াতের পথ রোধ করতে পারবে না এবং তুমি যে কাজে হাত দিয়েছো সব রকমের বাধা–বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ সম্পন্ন হবেই। এখন যদি এ লোকদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে সতর্ক করতে হয় তাহলে এ মু'জিযা তাদেরকে আগেই দেখানো হয়ে গেছে অর্থাৎ শুরুতে যাকিছু বলা হয়েছিল তা পূরা হয়ে গেছে, এদের কোন বিরোধিতাই ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি রুখে দিতে পারেনি এবং এদের এ প্রচেষ্টা তোমার এক চুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারেনি। এদের দেখার মতো চোখ থাকলে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এরা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, নবীর এ দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে।

আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাজতে রয়েছে—একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা বুরুজে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ
ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ
عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ
ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৭ রুকূ'

আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না।[৭৪] সে বললো, "আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি দিয়ে?" তারপর সে বললো, "দেখোতো ভাল করে, তুমি যে একে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো, এ কি এর যোগ্য ছিল? যদি তুমি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে আমি তার সমস্ত সন্তান সন্ততির মূলোচ্ছেদ করে দেবো,[৭৫] মাত্র সামান্য ক'জনই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যাও, এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে তুমিসহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۝ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝

"কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।" (আয়াত ঃ ১৯–২০)

৭১. মি'রাজের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাই এখানে রু'ইয়া শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এর মানে এখানে স্বপ্ন নয় বরং এখানে এর মানে হচ্ছে চোখে দেখা। এটা নিছক স্বপ্ন হলে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সামনে এটাকে স্বপ্ন হিসেবেই বর্ণনা করলে এটা তাদের জন্য ফিত্‌না হবার কোন কারণই ছিল না। একটার চাইতে একটা বেশী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা হয় এবং লোকদের সামনে বর্ণনাও করা হয় কিন্তু তা কখনো কারো জন্য এমন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না যে, লোকেরা এ জন্য যে স্বপ্ন দেখেছে তাকে বিদ্রূপ করতে থেকেছে এবং তার প্রতি মিথ্যাচার ও পাগলপনার অপবাদ দিয়েছে।

৭২. অর্থাৎ "যাক্কুম"। এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছে, এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে হবে। একে অভিশপ্ত করার মানে হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রহমত থেকে এ গাছটি দূরে থাকবে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর রহমতের

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۝

তুমি যাকে যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো,[৭৬] তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও,[৭৭] ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও[৭৮] এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো,[৭৯] —আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়,—নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না[৮০] এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।[৮১]

নিদর্শন নয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকদের আহারের সংস্থান করার জন্য এ গাছটি উৎপন্ন করবেন না বরং এটি হবে তাঁর লানতের নিদর্শন। অভিশপ্ত লোকদের জন্য তিনি এটি উৎপন্ন করবেন। তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। সূরা "দুখান"-এ এ গাছের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, জাহান্নামীরা যখন তা খাবে, তাদের পেটে আগুন লেগে যাবে, মনে হবে যেন তাদের পেটের মধ্যে গরম পানি টগবগ করে ফুটছে।

৭৩. অর্থাৎ এদের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে মি'রাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস সরাসরি দেখিয়েছি, যাতে তোমার মতো সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ লোকেরা যথার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এভাবে সতর্ক হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এরা উল্টো এ ঘটনার ভিত্তিতে তোমাকে বিদ্রূপ করেছে। আমি তোমার মাধ্যমে এদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছি যে, এখানে হারাম খাওয়ার পরিণামে তোমাদের যাক্কুম খেতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তারা এ বক্তব্যকে বিদ্রূপ করে বলেছে ঃ দেখো, দেখো, এ ব্যক্তির অবস্থা দেখো, একদিকে বলছে, জাহান্নামে আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে আবার অন্যদিকে খবর দিচ্ছে, সেখানে গাছ জন্মাবে!

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আল বাকারার ৪ রুকূ', আন নিসার ১৮ রুকূ', আল হিজ্‌রের ৩ রুকূ' এবং ইবরাহীমের ৪ রুকূ' দেখুন।

এ বক্তব্য প্রসংগে আলোচ্য ঘটনাটা আসলে যে কথা বুঝাবার জন্য বর্ণনা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, আল্লাহর মোকাবিলায় কাফেরদের এ অহংকার, সতর্কবাণীর প্রতি তাদের এ উপেক্ষা এবং বাঁকা পথে চলার জন্য তাদের এ অনমনীয় ঔদ্ধত্য ঠিক সেই শয়তানেরই

অনুকরণ যে প্রথম দিন থেকেই মানুষের শত্রুতা করে আসছে। এ কর্মনীতি অবলম্বন করে এরা আসলে এমন একটি জালে জড়িয়ে পড়ছে যে জালে আদমের বংশধরদেরকে জড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার জন্য শয়তান মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্নেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল।

৭৫. "মূলোচ্ছেদ করে দেবো," অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার পথ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবো। 'ইহ্‌তিনাক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, কোন জিনিসকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা। যেহেতু মানুষের আসল মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত এবং এর দাবী হচ্ছে আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকা, তাই এ মর্যাদা থেকে তার সরে যাওয়া গাছকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলারই মতো।

৭৬. মূলে "ইস্‌তিফ্‌যায" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে হাল্‌কা করা। অর্থাৎ দুর্বল বা হাল্‌কা পেয়ে কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বা তার পা পিছ্‌লিয়ে দেয়া।

৭৭. এ বাক্যাংশে শয়তানকে এমন একটি ডাকাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক ডাকাত বাহিনী নিয়ে একটি জনপদ আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হুকুম দিতে থাকে, এদিকে লুটপাট করো, ওদিকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালাও এবং সেদিকে ধ্বংস করো। শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বলতে এমনসব অসংখ্য জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতিতে ও বিভিন্নভাবে ইবলীসের মানব বিধ্বংসী অভিযানে সহযোগিতা করছে।

৭৮. এ বাক্যাংশটি বড়ই অর্থপূর্ণ। এখানে শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাংগ ছবি আঁকা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও তা খরচ করার ব্যাপারে শয়তানের ইংগিতে নড়াচড়া করে, তার সাথে যেন শয়তান বিনা অর্থ ব্যয়ে শরীক হয়ে গেছে। পরিশ্রমে তার কোন অংশ নেই, অপরাধ, পাপ ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতিতে সে অংশীদার নয়, কিন্তু তার ইংগিতে এ নির্বোধ এমনভাবে চলছে যেন তার ব্যবসায়ে সে সমান অংশীদার বরং বৃহত্তম অংশীদার। এভাবে সন্তান তো হয় মানুষের নিজের এবং তাকে লালন পালন করার জন্য সে নিজের সব যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু শয়তানের ইংগিতে এ সন্তানকে সে এমনভাবে গোমরাহী ও নৈতিক চরিত্রহীনতার শিক্ষা দেয় যেন মনে হয় সে একা এ সন্তানের বাপ নয় বরং তার পিতৃত্বে শয়তানেরও শরীকানা আছে।

৭৯. অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখো এবং মিথ্যার আকাশ কুসুম রচনা করে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দাও।

৮০. এর দু'টি অর্থ। স্ব স্ব স্থানে দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, আমার বান্দা অর্থাৎ মানুষের ওপর তুমি এমন কর্তৃত্ব লাভ করবে না, যার ফলে তুমি তাদেরকে জবরদস্তি নিজের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারো। তুমি নিছক প্ররোচিত করতে ও ফুসলাতে এবং ভুল পরামর্শ দিতে ও মিথ্যা ওয়াদা করতে পারো। কিন্তু তোমার কথা গ্রহণ করা বা না করা হবে বান্দার নিজের কাজ। তারা তোমার পথে যেতে চাইলে বা না চাইলেও তুমি হাত ধরে তাদেরকে নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে —তোমার এমন ধরনের কোন কর্তৃত্ব তাদের ওপর থাকবে না। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমার বিশেষ বান্দাদের অর্থাৎ নেক বান্দাদের ওপর তোমার কোন প্রভাব খাটবে না। শক্তিহীন ও দুর্বল সংকল্পধারী লোকেরা

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞

তোমাদের (আসল) রব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন,[৮২] যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো।[৮৩] আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল। যখন সাগরে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাকে তোমরা ডাকো সবাই অন্তর্হিত হয়ে যায়।[৮৪] কিন্তু যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ সত্যিই বড়ই অকৃতজ্ঞ।

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে, কিন্তু যারা আমার বন্দেগীতে অবিচল থাকবে তারা কখনো তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

৮১.অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা তাঁর পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে তাদের এ আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোন সহায় ও নির্ভরের প্রয়োজন হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাত ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।

৮২. ওপরের ধারাবাহিক বর্ণনার সাথে এর সম্পর্ক বুঝতে হলে এ রুকূ'র শুরুতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে তার প্রতি আর একবার নজর বুলাতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ইবলীস আদম সন্তানদের পেছনে লেগেছে। সে তাদেরকে আশার ছলনা দিয়ে ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জালে জড়িয়ে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তারা তার যোগ্য নয়। এ বিপদ থেকে যদি কোন জিনিস মানুষকে বাঁচাতে পারে তাহলে তা হচ্ছে কেবল এই যে, মানুষকে তার রবের বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকতে হবে, পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে রুজু করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় যে কোন পথই মানুষ অবলম্বন করবে তার সাহায্যে সে শয়তানের জাল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।—এ ভাষণ থেকে আপনা আপনিই একথা বের হয়ে আসে যে, যারা তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে এবং শির্কের ওপর জোর দিয়ে চলছে, তারা আসলে নিজেরাই

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ
لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি এ ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক যে, আল্লাহ কখনো স্থলদেশেই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণি পাঠাবেন না এবং তোমরা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন সহায়ক পাবে না? আর তোমাদের কি এ ধরনের কোন আশংকা নেই যে, আল্লাহ আবার কোন সময় তোমাদের সাগরে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘূর্ণি পাঠিয়ে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন এবং তোমরা এমন কাউকে পাবে না যে, তাঁর কাছে তোমাদের এ পরিণতির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে? —এতো আমার অনুগ্রহ, আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক–পবিত্র জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।[৮৫]

নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই এখানে তাওহীদের সত্যতা সপ্রমাণ করা হচ্ছে এবং শির্ককে বাতিল করে দেয়া হচ্ছে।

৮৩. অর্থাৎ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে যেসব অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক, জ্ঞানগত ও চিন্তাগত কল্যাণ লাভ করা যায় তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করো।

৮৪. অর্থাৎ এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, তোমাদের আসল স্বভাব প্রকৃতি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই রব বলে স্বীকার করে না এবং তোমাদের নিজেদের অন্তরের গভীর তলদেশে এ চেতনা চিরঞ্জীব রয়েছে যে, লাভ ও ক্ষতি করার আসল ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে। নয়তো যখন আসল সাহায্য করার সময় হয় তখন তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী আছে বলে মনে করতে পারো না কেন? এর কারণ কি?

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿৭১﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿৭২﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿৭৩﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿৭৪﴾ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿৭৫﴾

৮ রুকূ'

তারপর সেই দিনের কথা মনে করো যেদিন আমি মানুষের প্রত্যেকটি দলকে তার নেতা সহকারে ডাকবো। সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কার্যকলাপ পাঠ করবে[৮৬] এবং তাদের ওপর সামান্যতমও জুলুম করা হবে না আর যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকে সে আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চাইতেও বেশী ব্যর্থ।

হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আমি যে অহী পাঠিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এ লোকেরা তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টায় কসুর করেনি, যাতে তুমি আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা তৈরী করো।[৮৭] যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো। আর যদি আমি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তাহলে তোমার পক্ষে তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে আমি এ দুনিয়ায় তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তির মজা টের পাইয়ে দিতাম এবং আখেরাতেও, তারপর আমার মোকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।[৮৮]

৮৫. অর্থাৎ এটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য যে, কোন জিন, ফেরেশ্‌তা বা গ্রহ–নক্ষত্র মানব জাতিকে পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব দান করেনি। কোন

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا
يَلْبَثُونَ خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

আর এরা এ দেশ থেকে তোমাকে উৎখাত করার এবং এখান থেকে তোমাকে বের করে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু যদি এরা এমনটি করে তাহলে তোমার পর এরা নিজেরাই এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না।[৮৯]

এটি আমার স্থায়ী কর্মপদ্ধতি। তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবার ব্যাপারে একর্ম পদ্ধতি আরোপ করেছিলাম।[৯০] *আর আমার কর্মপদ্ধতিতে তুমি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।*

নবী বা অলী তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে এ কর্তৃত্ব দান করেনি। নিশ্চিতভাবেই এটা আল্লাহরই দান এবং তাঁর অনুগ্রহ। তারপর মানুষ এহেন মর্যাদা লাভ করার পর আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির সামনে মাথা অবনত করবে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় বোকামী ও মূর্খতা আর কী হতে পারে?

৮৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নেক লোকদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে এবং তারা সানন্দে তা দেখতে থাকবে বরং অন্যদেরকেও দেখাবে। অন্যদিকে অসৎলোকদের দুষ্কৃতির তালিকা তাদের বাঁ হাতে দেয়া হবে এবং তারা তা পাওয়ার সাথে সাথেই পেছন দিকে লুকাবার চেষ্টা করবে। এ প্রসংগে দেখুন সূরা আল হাক্কাহ ১৯–২৮ এবং ইনশিকাক ৭–১৩ আয়াত।

৮৭. বিগত দশ বারো বছর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যে অবস্থার সাথে যুঝছিলেন এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলেন মক্কার কাফেররা তাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল তিনি তাদের শির্ক ও জাহেলী রসম রেওয়াজের সাথে কিছু না কিছু সমঝোতা করে নেবেন। এ উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে ফিত্‌নার মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলো। তাঁকে ধোঁকা দিল, লোভ দেখালো, হুমকি দিল এবং মিথ্যা প্রচারণার তুফান ছুটালো। তারা তাঁর প্রতি জুলুম নিপীড়ন চালালো ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলো। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করলো। একটি মানুষের সংকল্পকে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য যা কিছু করা যেতে পারে তা সবই তারা করে ফেললো।

৮৮. এ সমগ্র কার্যবিবরণীর ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ দু'টি কথা বলেছেন। এক, যদি তুমি সত্যকে সত্য জানার পর মিথ্যার সাথে কোন আপোস করে নিতে তাহলে বিক্ষুব্ধ জাতি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর গযব তোমার ওপর নেমে পড়তো এবং তোমাকে দুনিয়ায় ও আখেরাত উভয় স্থানেই দ্বিগুণ সাজা দেয়া হতো। দুই,

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৯ রুকূ'

নামায কায়েম করো[৯১] সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে[৯২] নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[৯৩] এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো।[৯৪] কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৯৫]

মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ–সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মোকাবিলা করতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সাহায্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের ওপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন এবং বিপদের সয়লাব স্রোত তাঁকে একচুলও স্থানচ্যুত করতে পারেনি।

৮৯. এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় এটি তো নিছক একটি হুমকি মনে হচ্ছিল। কিন্তু দশ বারো বছরের মধ্যেই এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেলো। এ সূরা নাযিলের এক বছর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং এরপর ৮ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়ায্‌যমায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুশরিক শূন্য করা হলো। এরপর যারাই এ দেশে বসবাস করেছে মুসলমান হিসেবেই বসবাস করেছে, মুশরিক হিসেবে কেউ সেখানে টিকতে পারেনি।

৯০. সকল নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ যে জাতি তাদেরকে হত্যা ও দেশান্তরী করেছে, তারপর সে আর বেশীদিন স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেনি। এরপর হয় আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা কোন শত্রু ভাবাপন্ন জাতিকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা সেই নবীর অনুসারীদের দ্বারা তাকে বিপর্যস্ত ও বিজিত করা হয়েছে।

৯১. পর্বত প্রমাণ সমস্যা ও সংকটের আলোচনা করার পর পরই নামায কায়েম করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করেছেন যে, এ অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য যে অবিচলতার প্রয়োজন হয় তা নামায কায়েমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

৯২. دلوك الشمس এর অনুবাদ করেছি "সূর্য ঢলে পড়া।" অবশ্যি কোন কোন সাহাবা ও তাবেঈ "দুলূক" অর্থ নিয়েছেন সূর্যাস্ত। কিন্তু অধিকাংশের মতে এর অর্থ হচ্ছে দুপুরে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া। হযরত উমর, ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালিক, আবু বারযাতাল আসলামী, হাসান বাস্‌রী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ এবং একটি বর্ণনামতে ইবনে

আব্বাসও এ মতের সমর্থক। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। বরং কোন কোন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও دلوك الشمس এর এ ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত হয়েছে, যদিও এর সনদ তেমন বেশী শক্তিশালী নয়।

৯৩. غسق الليل এর অর্থ কেউ কেউ নিয়েছেন "রাতের পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাওয়া।" আবার কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্যরাত। যদি প্রথম অর্থটি মেনে নেয়া হয় তাহলে এর মানে হবে এশার প্রথম ওয়াক্ত। আর দ্বিতীয় অর্থটি মেনে নিলে এখানে এশার শেষ ওয়াক্তের দিকে ইংগিত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৯৪. ফজর শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। অর্থাৎ একেবারে সেই প্রথম লগ্নটি যখন প্রভাতের শুভ্রতা রাতের আঁধার চিরে উঁকি দিতে থাকে।

ফজরের কুরআন পাঠ মানে হচ্ছে, ফজরের নামায, কুরআন মজীদে নামাযের প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কোথাও তার বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে কোন একটির নাম নিয়ে সমগ্র নামাযটি ধরা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, যিকির, হাম্‌দ (প্রশংসা), কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূ', সিজ্‌দাহ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এখানে ফজরের সময় কুরআন পড়ার মানে শুধু কুরআন পাঠ করা নয় বরং নামাযে কুরআন পাঠ করা। এভাবে নামাযের উপাদান ও অংশ কি ধরনের হতে হবে কুরআন মজীদ সেদিকে পরোক্ষ ইংগিত দিয়েছে। আর এ ইংগিতের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাঠামো নির্মাণ করেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে নামাযের এ কাঠামোই প্রচলিত।

৯৫. ফজরের কুরআন পরিলক্ষিত হওয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহর ফেরেশতারা এর সাক্ষী হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা বর্ণনা করা হয়েছে যদিও ফেরেশতারা প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক সৎকাজের সাক্ষী তবুও যখন ফজরের নামাযের কুরআন পাঠে তাদের সাক্ষের কথা বলা হয়েছে তখন এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ কাজটি একটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে দীর্ঘ আয়াত ও সূরা পড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং পরবর্তী ইমামগণ একে মুস্তাহাব গণ্য করেন।

এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি নামায পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। আর বাকি চারটি নামায সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ হুকুমটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"জিব্রীল দু'বার আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় নামায পড়ান' প্রথম দিন যোহরের নামায ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার চাইতে বেশী লম্বা হয়নি। তারপর আসরের নামায পড়ান এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ ছিল। এরপর মাগরিবের নামায এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। অতপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার নামায পড়ান আর ফজরের নামায পড়ান ঠিক যখন রোযাদারের ওপর খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের নামায এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমান ছিল। আসরের নামায পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের নামায পড়ান এমন সময় যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। এশার নামায পড়ান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের নামায পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিব্রীল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ। এই হচ্ছে নবীদের নামায পড়ার সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে নামাযের সঠিক সময়।" (অর্থাৎ প্রথম দিন প্রত্যেক নামাযের প্রথম সময় এবং দ্বিতীয় দিন শেষ সময় বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায এ দু'টি সময়ের মাঝখানে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায়ও পাঁচটি নামাযের এ ওয়াক্তসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং কিছু রাত পার হয়ে গেলে (অর্থাৎ এশা)।" (১১৪ আয়াত)

সূরা 'তা–হা'য়ে বলা হয়েছে ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ –

"আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)" [১৩০ আয়াত]

তারপর সূরা রূমে বলা হয়েছে ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○

"কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।"
[১৭-১৮ আয়াত]

নামাযের সময় নির্ধারণ করার সময় যেসব প্রয়োজনীয় দিকে নজর রাখা হয়েছে তার মধ্যে সূর্য পূজারীদের ইবাদাতের সময় থেকে দূরে থাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল যুগেই সূর্য মুশরিকদের সবচেয়ে বড় বা অনেক বড় মাবুদের স্থান দখল করেছে। সূর্য উদয় ও অস্তের সময়টায়ই তারা বিশেষ করে তার পূজা করে থাকে। তাই এসব সময় নামায পড়াকে হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণত সূর্য উদয়ের পর থেকে নিয়ে মধ্য গগণে পৌঁছার সময়ে তার পূজা করা হয়ে থাকে। কাজেই ইসলামে হুকুম দেয়া হয়েছে, দিনের বেলার নামাযগুলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে পড়া শুরু করতে হবে এবং সকালের নামায সূর্য উদিত হবার আগেই পড়ে ফেলতে হবে। এ প্রয়োজনীয় বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) বর্ণনা করছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطن وحينئذ يسجد له الكفار -

"ফজরের নামায পড়ো এবং সূর্য উদিত হতে থাকলে বিরত হও, সূর্য ওপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। কারণ সূর্য যখন উদিত হয় তখন শয়তানের শিং দু'টির মাঝখান দিয়ে বের হতে থাকে এবং এ সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে।"

তারপর তিনি আসরের নামাযের উল্লেখ করার পর বললেন ঃ

ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار -

"তারপর নামায থেকে বিরত হও সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের শিং দু'টির মাঝখানে অস্ত যায় এবং এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।" (মুসলিম)

এ হাদীসে সূর্যের শয়তানের শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়াকে একটা রূপক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় শয়তান লোকদের জন্য একটি বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়। লোকেরা যখন সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় তার সামনে সিজদা করে তখন যেন মনে হয় শয়তান তাকে নিজের মাথায় করে এনেছে এবং মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। রসূল (স) তাঁর নিজের নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে এ রূপকের রহস্য ভেদ করেছেন "এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।"

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো[৯৬] এটি তোমার জন্য নফল।[৯৭] অচিরেই তোমার রব তোমাকে "প্রশংসিত স্থানে"[৯৮] প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আর দোয়া করো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো।[৯৯] এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।[১০০]

৯৬. তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ভেংগে উঠে পড়া। কাজেই রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো মানে হচ্ছে, রাতের একটি অংশে ঘুমুবার পর উঠে নামায পড়ে নাও।

৯৭. নফল মানে ফরযের অতিরিক্ত। এ থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আগের আয়াতে যে পাঁচটি নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলো ফরয এবং এ ষষ্ঠ নামাযটি ফরযের অতিরিক্ত।

৯৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তোমাদেরকে এমন মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন যেখানে তোমরা মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়ে থাকবে। চারদিক থেকে তোমাদের ওপর প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে। তোমাদের অস্তিত্ব দুনিয়ায় একটি প্রশংসনীয় অস্তিত্বে পরিণত হবে। আজ তোমাদের বিরোধীরা গালাগালি ও নিন্দাবাদের মাধ্যমে তোমাদের অভ্যর্থনা করছে এবং সারাদেশে তোমাদের বদনাম করার জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের তুফান সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু সে সময় দূরে নয় যখন সারা দুনিয়ায় তোমাদের প্রশংসা শ্রুত হবে এবং আখেরাতেও তোমরা সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসার অধিকারী হবে। কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতকারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এ প্রশংসনীয় মর্যাদারই একটি অংশ।

৯৯. এ দোয়ার নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরতের সময় তখন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছিল তাই বলা হয়েছে, তোমাদের এ মর্মে দোয়া করা উচিত যে, সত্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যেন কোনক্রমেই তোমাদের হাতছাড়া না হয়। যেখান থেকেই বের হও সততা, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় পরায়ণতার খাতিরেই বের হও এবং যেখানেই যাও সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে যাও।

১০০ অর্থাৎ তুমি নিজেই আমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করো অথবা কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যাতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

আর ঘোষণা করে দাও, "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।"[১০১]

আমি এই কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমনসব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং জালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।[১০২] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমি তাকে নিয়ামত দান করি তখন সে গর্ব করে ও পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সামান্য বিপদের মুখোমুখি হয় তখন হতাশ হয়ে যেতে থাকে। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে কাজ করছে, এখন একমাত্র তোমাদের রবই ভাল জানেন কে আছে সরল সঠিক পথে।"

দুনিয়ার বিকৃত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সয়লাব রুখে দিতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বাস্‌রী ও কাতাদাহ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের ন্যায় মহান তাফসীরকারগণও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এরি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

"আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যেগুলোর উচ্ছেদ ঘটান না।"

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধুমাত্র ওয়াজ–নসিহতের মাধ্যমে হতে পারে না বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। তারপর আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর নবীকে এ দোয়া শিখিয়েছেন তখন এ থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী আইন প্রবর্তন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি জারী করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা হাসিল করার প্রত্যাশা করা এবং এ জন্য প্রচেষ্টা

চালানো শুধু জায়েযই নয় বরং কাংখিত ও প্রশংসিতও এবং অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা ও দুনিয়াদারী বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা বলা যায়। কিন্তু আল্লাহর দীনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করা বৈষয়িক স্বার্থ পূজা নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবী।

১০১. এ ঘোষণা এমন এক সময় করা হয়েছিল যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে হাবৃশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাদবাকি মুসলমানরা চরম অসহায় ও মজলুম অবস্থার মধ্যে মক্কা ও আশপাশের এলাকায় জীবন যাপন করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের অবস্থাও সব সময় বিপদ সংকুল ছিল। সে সময় বাহ্যত বাতিলেরই রাজত্ব চলছিল। হকের বিজয়ের কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হলো, তুমি বাতিল পন্থীদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দাও যে, হক এসে গেছে এবং বাতিল খতম হয়ে গেছে। এ সময় এ ধরনের ঘোষণা লোকদের কাছে নিছক কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তারা একে ঠাট্টা–মস্করা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপর মাত্র ৯টি বছর অতিক্রান্ত না হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং কা'বা ঘরে প্রবেশ করে সেখানে তিনশো যাটটি মূর্তির আকারে যে বাতিলকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে খতম করে দিলেন। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কা'বার মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ○ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ –

১০২. অর্থাৎ যারা এ কুরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং নিজেদের জন্য আইনের কিতাব বলে মেনে নেয় তাদের জন্য তো এটি আল্লাহর রহমত এবং তাদের যাবতীয় মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক রোগের নিরাময়। কিন্তু যেসব জালেম একে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে এ কুরআন তাদেরকে এর নাযিল হবার বা একে জানার আগে তারা যে অবস্থায় ছিল তার ওপরও টিকে থাকতে দেয় না। বরং তাদেরকে আরো বেশী ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেয়। এর কারণ, যতদিন কুরআন আসেনি অথবা যতদিন তারা কুরআনের সাথে পরিচিত হয়নি ততদিন তাদের ক্ষতি ছিল নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতার ক্ষতি। কিন্তু যখন কুরআন তাদের সামনে এসে গেলো এবং সে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল তখন তাদের ওপর আল্লাহর দাবী অকাট্যভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলো। এখন যদি তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে গোমরাহীর ওপর অবিচল থাকার জন্য জোর দেয় তাহলে এর অর্থ হয় তারা অজ্ঞ নয় বরং জালেম ও বাতিল পন্থী এবং সত্যের প্রতি বিরূপ। এখন তাদের অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মতো যে বিষ ও বিষের প্রতিশেধক উভয়টি দেখে বিষকে বেছে নেয়। নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য এখন তারা নিজেরাই হয় পুরোপুরি দায়ী এবং এরপর তারা যে কোন পাপ করে তার পূর্ণ শাস্তির অধিকারীও তারাই

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

১০ রুকূ'

এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, "এই রূহ আমার রবের হুকুমে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।"[১০৩] আর হে মুহাম্মাদ! আমি চাইলে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি আমার মোকাবিলায় কোন সহায়ক পাবে না, যে তা ফিরিয়ে আনতে পারে। এই যে যা কিছু তুমি লাভ করেছো, এসব তোমার রবের অনুগ্রহ, আসলে তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি অনেক বড়।[১০৪] বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোন একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।[১০৫]

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার করার ওপরই অবিচল থাকে।

হয়। এটি অজ্ঞতার নয় বরং জেনে শুনে দুষ্টামি ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি এবং অজ্ঞতার ক্ষতির চাইতে এর পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট তাৎপর্যবহ বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ অর্থাৎ কুরআন হয় তোমার সপক্ষে প্রমাণ আর নয়তো তোমার বিপক্ষে প্রমাণ।

১০৩. সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে এখানে রূহ মানে প্রাণ। অর্থাৎ লোকেরা জীবনীশক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে,

এর প্রকৃত স্বরূপ কি এবং এর জবাবে বলা হয়েছে, এটি আল্লাহর হুকুমে আসে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি কোনক্রমেই সম্মত নই। কারণ এ অর্থ একমাত্র তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন পূর্বাপর আলোচনার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এবং বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এ আয়াতকে একটি একক বাক্য হিসেবে নেয়া হবে। নয়তো বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে রূহকে প্রাণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে আয়াতে মারাত্মক ধরনের সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এ বিষয়টির কোন যুক্তিসংগত কারণ বুঝা যায় না যে, যেখানে তিনটি আয়াতে কুরআনের নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র হবার এবং কুরআন অমান্যকারীদের জালেম ও নিয়ামত অস্বীকারকারী হবার কথা বলা হয়েছে এবং যেখানে পরবর্তী আয়াতগুলো আবার কুরআনের আল্লাহর কালাম হবার ওপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেখানে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ বিষয়বস্তু এসে গেছে যে, প্রাণীদের মধ্যে প্রাণ আসে আল্লাহর হুকুমে?

আলোচনার যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিচার করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে রূহ মানে "অহী" বা অহী বহনকারী ফেরেশ্তাই হতে পারে। মুশরিকদের প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, কুরআন তুমি কোথায় থেকে আনো? একথায় আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে লোকেরা রূহ অর্থাৎ কুরআনের উৎস অথবা কুরআন লাভ করার মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, এ রূহ আসে আমার রবের হুকুমে। কিন্তু তোমাদের জ্ঞান এত কম যে, তোমরা মানুষের বাণী এবং আল্লাহর অহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে ফারাক করতে পারো না এবং এ বাণীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো যে, কোন মানুষ এটি তৈরী করছে। শুধু যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভাষণের সাথে আয়াতের যোগসূত্র রক্ষা করার প্রয়োজনেই এ ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভের যোগ্য তা নয় বরং কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এসব শব্দ সহকারেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

"তিনি নিজের হুকুমে নিজের যে বান্দার ওপর চান রূহ নাযিল করেন, যাতে লোকদের একত্র হবার দিন সম্পর্কে সে সতর্ক করে দিতে পারে।" (১৫ আয়াত)

সূরা শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

"আর এভাবেই আমি নিজের হুকুমে তোমার প্রতি একটি রূহ পাঠিয়েছি, তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি।" (৫২ আয়াত)

পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (র) ও হাসান বাসরীও (র) এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। ইবনে জারীর এ ব্যাখ্যাকে কাতাদার বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একটি অদ্ভুত কথা লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস গোপনে এ মত ব্যক্ত করতেন। অন্যদিকে তাফসীরে রূহুল মা'আনী–এর লেখক হাসান ও কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "রূহ বলতে জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে এবং প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, তা কিভাবে নাযিল হয় এবং কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে অহী প্রক্ষিপ্ত হয়।"

১০৪. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে কাফেরদেরকে কষ্ট দেয়া। কারণ তারা বলতো, কুরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী বা গোপনে অন্য কোন লোকের কাছ থেকে শেখানো বাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ এ বাণী পয়গম্বর রচনা করেননি বরং আমি প্রদান করেছি এবং যদি আমি এ বাণী ছিনিয়ে নিই তাহলে এ ধরনের বাণী রচনা করে নিয়ে আসার ক্ষমতা পয়গম্বরের নেই। তাছাড়া দ্বিতীয় কোন শক্তিও নেই যে এ ব্যক্তিকে এ ধরনের মহাশক্তিধর কিতাব পেশ করার যোগ্য করে তুলতে পারে।

১০৫. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো তিন জায়গায় এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ৩ রুকূ', সূরা ইউনুসের ৪ রুকূ' এবং সূরা হূদের ২ রুকূ'তে এ চ্যালেঞ্জ এসেছে। সামনে সূরা তূরের ২ রুকূ'তেও এ বিষয়বস্তু আসছে। এসব জায়গায় কাফেরদের যে অপবাদের জবাবে একথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআন রচনা করেছেন এবং অযথা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে পেশ করছেন। এ ছাড়াও সূরা ইউনুসের ১৬ আয়াতে এ অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

"হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কুরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ না চাইতেন, তাহলে আমি কখনোই শুনাতে পারতাম না বরং তোমাদের এর খবরও দিতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে আসছি। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?"

এ আয়াতগুলোতে কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম হবার সপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তিন ধরনের ঃ

এক ঃ এ কুরআন স্বীয় ভাষা, বর্ণনা পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, আলোচনা, শিক্ষা ও গায়েবের খবর পরিবেশনের দিক দিয়ে একটি মু'জিযা। এর নজির উপস্থাপন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তোমরা বলছো একজন মানুষ এটা রচনা করেছে। কিন্তু আমি বলছি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলেও এ ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে পারবে না। বরং মুশরিকরা যে জিনদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে এবং এ কিতাব যাদের মাবুদ হবার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আঘাত হানছে তারাও যদি কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করার জন্য একাট্টা হয়ে যায় তাহলে তারাও এদেরকে এ কুরআনের সমমানের একটি কিতাব রচনা করে দিয়ে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার যোগ্য করতে পারবে না।

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তোমাদের মধ্যে বাইর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। বরং এ কুরআন নাযিলের পূর্বেও ৪০ বছর তোমাদের মধ্যেই বসবাস করেছেন। নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও কি কখনো তোমরা তাঁর মুখে এই ধরনের কালাম এবং এই ধরনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্বলিত বাণী শুনেছিলে? যদি না শুনে থাকো এবং নিশ্চিতভাবেই শুনোনি তাহলে কোন ব্যক্তির ভাষা, চিন্তাধারা,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ
لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

তারা বলে, "আমরা তোমার কথা মানবো না যতক্ষণ না তুমি ভূমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করে দেবে। অথবা তোমার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করে দেবে নদী–নালা। অথবা তুমি আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে তোমার হুমকি অনুযায়ী আমাদের ওপর ফেলে দেবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরী হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো।"— হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, পাক–পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু?[১০৬]

তথ্যজ্ঞান এবং চিন্তা ও বর্ণনা ভংগীতে হঠাৎ রাতারাতি এ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না, একথা কি তোমরা বুঝতে পারছো?

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে দিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যান না বরং তোমাদের মধ্যেই থাকেন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআন শুনে থাকো এবং অন্যান্য আলোচনা ও বক্তৃতাও শুনে থাকো। কুরআনের কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কালামের ভাষা ও বর্ণনা ভংগীর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে কোন এক ব্যক্তির এ ধরনের দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইল কোনক্রমে হতেই পারে না। এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের দেশের লোকদের মধ্যে বাস করতেন তখনই ছিল না বরং আজো হাদীসের কিতাবগুলোর মধ্যে তাঁর শত শত উক্তি ও ভাষণ অবিকৃত রয়েছে এগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এগুলোর ভাষা ও বর্ণনাভংগীর সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনা–

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ
اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا
بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

১১ রুকূ'

লোকদের কাছে যখনই কোন পথনির্দেশ আসে তখন তাদের একটা কথাই তাদের ঈমান আনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কথাটা এই যে, "আল্লাহ কি মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?"[১০৭] তাদেরকে বলো, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোন ফেরেশতাকেই তাদের কাছে রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।[১০৮]

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমারও তোমাদের শুধু একমাত্র আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং সবকিছু দেখছেন।[১০৯]

যাকে আল্লাহ পথ দেখান সে-ই পথ লাভ করে এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি তাঁকে ছাড়া আর কোন সহায়ক ও সাহায্যকারী পেতে পারো না।[১১০] এ লোকগুলোকে আমি কিয়ামতের দিন উপুড় করে টেনে আনবো অন্ধ, বোবা ও বধির করে।[১১১] এদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে থাকবে আমি তাকে আরো জোরে জ্বালিয়ে দেবো।

ভংগীর এত বেশী পার্থক্য লক্ষণীয় যে, ভাষা ও সাহিত্যের কোন উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক এ দু'টিকে এক ব্যক্তির কালাম বলে দাবী করতে পারেন না।

১০৬. মু'জিযা দাবী করার একটি জবাব এর আগে ৬ রুকূ'র وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। এখানে এ দাবীর দ্বিতীয় জবাব দেয়া হয়েছে। এ

সংক্ষিপ্ত জবাবটির মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের অতুলনীয় অলংকার। বিরোধীদের দাবী ছিল, যদি তুমি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো তাহলে যমীনের দিকে ইশারা করো এবং তার ফলে অকস্মাৎ একটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হোক, অথবা এখনই একটি সবুজ শ্যামল বাগান তৈরী হয়ে যাক এবং তার মধ্যে নদীনালা বয়ে চলুক। আকাশের দিকে ইশারা করো এবং সংগে সংগেই আকাশ ভেংগে চৌচির হয়ে তোমার বিরোধিতাকারীদের ওপর পড়ুক। একটা ফুঁক দাও এবং চোখের পলকে একটি সোনার প্রাসাদ গড়ে উঠুক। একটা আওয়াজ দাও এবং দেখতে না দেখেতেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা সামনে এসে দাঁড়াক এবং তাঁরা সাক্ষ দিক যে, আমরা মুহাম্মাদকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। আমাদের চোখের সামনে আকাশে উঠে যাও এবং আল্লাহর কাছ থেকে একটি পত্র আমাদের নামে লিখিয়ে আনো। এ পত্রটি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করবো এবং নিজেদের চোখে দেখে পড়বো।—এসব লম্বা চওড়া দাবী দাওয়ার জবাবে একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, "এদেরকে বলে দাও, আমার পরওয়ারদিগার পাক-পবিত্র! আমি একজন বাণীবাহক ছাড়া কি অন্য কিছু?" অর্থাৎ নির্বোধের দল! আমি কি আল্লাহ হবার দাবী করেছিলাম? তাহলে তোমরা কেন আমার কাছে এ দাবী করছো? আমি কবে তোমাদের বলেছিলাম, আমি সর্বশক্তিমান? আমি কবে বলেছিলাম, এ পৃথিবী ও আকাশে আমার শাসন চলছে? আমার দাবী তো প্রথম দিন থেকে এটিই ছিল যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী বহনকারী একজন মানুষ। তোমাদের যদি যাচাই করতে হয় তাহলে আমার বাণী যাচাই করো। ঈমান আনতে হলে এ বাণীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করে ঈমান আনো। আর অস্বীকার করতে হলে এ বাণীর মধ্যে কোন ত্রুটি বের করে দেখাও। আমার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে একজন মানুষ হিসেবে আমার জীবন, চরিত্র ও কার্যকলাপ দেখো। এ সবকিছু বাদ দিয়ে তোমরা আমার কাছে এ যমীন চিরে ফেলা এবং আকাশ ভেংগে ফেলার কি সব উদ্ভট দাবী নিয়ে এসেছো? নবুওয়াতী কাজের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক?

১০৭. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে যে, মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না। তাই যখন কোন রসূল এসেছেন এবং তারা দেখেছে তিনি পানাহার করছেন, তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদি আছে, তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ তখন তারা ফায়সালা দিয়ে বসেছে যে, এ ব্যক্তি রসূল নয়, কারণ এতো মানুষ। আর তিনি চলে যাবার দীর্ঘকাল পর তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমনসব লোক জন্ম নিতে থাকে যারা বলতে থাকে, তিনি মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন রসূল। ফলে কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়েছে, কেউ বানিয়েছে আল্লাহর পুত্র, আবার কেউ বলেছে আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মোটকথা মানবিক সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার একই সত্তার মধ্যে একত্র হওয়া হামেশা মূর্খদের কাছে একটি হেঁয়ালি হয়েই থেকেছে।

১০৮. অর্থাৎ মানুষের কাছে গিয়ে পয়গাম শুনিয়ে দেয়া হলো, শুধু এতটুকুই নবীর কাজ নয়। বরং এ পয়গাম অনুযায়ী মানব জীবনের সংশোধন করাও তাঁর কাজ। তাঁকে এ পয়গামের মূলনীতিগুলোকে মানবিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে প্রয়োগ করতে হয়। নিজের জীবনেও এ নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে হয়। যে অসংখ্য মানুষ এ পয়গাম শুনার ও বুঝার চেষ্টা করে তাদের মনে যেসব জটিল প্রশ্ন জাগে সেগুলোর জবাব তাঁকে

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ
اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ
اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ
خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

এটা হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে এবং বলেছে "যখন আমরা শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার আমাদের নতুন করে পয়দা করে উঠানো হবে?" তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু জালেমরা জিদ ধরেছে যে তারা তা অস্বীকারই করে যাবে।

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের অধীনে থাকতো তাহলে তোমরা ব্যয় হয়ে যাবার আশংকায় নিশ্চিতভাবেই তা ধরে রাখতে। সত্যিই মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।[১১২]

দিতে হয়। যারা এ পয়গাম গ্রহণ করে, এর শিক্ষাবলীর ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করার ও প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। বিকৃতি ও ধ্বংসের সমর্থক শক্তিগুলোকে দাবিয়ে দেবার এবং যে সংস্কারের কর্মসূচী দিয়ে আল্লাহ নিজের নবী পাঠিয়েছেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁকে অস্বীকার, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলায় প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়। এসব কাজ যখন মানুষের মধ্যেই করতে হয় তখন এগুলোর জন্য মানুষ ছাড়া আর কাকে পাঠানো যায়? ফেরেশতা তো বড় জোর এসে পয়গাম পৌছিয়ে দিয়ে চলে যেতো। মানুষের মধ্যে মানুষের মতো বসবাস করে মানুষের মতো কাজ করা এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের জীবনে সংস্কার সাধন করে দেখিয়ে দেয়া কোন ফেরেশতার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একজন মানুষই ছিল এ কাজের উপযোগী।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১২ রুকূ'

আমি মূসাকে নয়টি নিদর্শন দিয়েছিলাম, সেগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।[১১৩] *এখন নিজেরাই তোমরা বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখে নাও যখন সেগুলো তাদের সামনে এলো তখন ফেরাউন তো একথাই বলেছিল, "হে মূসা! আমার মতে তুমি অবশ্যই একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।"*[১১৪]

১০৯. অর্থাৎ যেসব বহুবিধ পদ্ধতিতে আমি তোমাদের বুঝাচ্ছি এবং তোমাদের অবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তাও আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছো তাও আল্লাহ দেখছেন। এসব কিছুর পর শেষ পর্যন্ত ফায়সালা তাঁকেই করতে হবে। তাই শুধুমাত্র তাঁর জানা ও দেখাই যথেষ্ট।

১১০. অর্থাৎ যার ভ্রষ্টতা প্রীতি ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তার জন্য সঠিক পথের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং যাকে আল্লাহ এমনসব ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যেদিকে সে যেতে চাচ্ছিল, তাকে এখন সঠিক পথের দিকে নিয়ে আসার ক্ষমতা আর কার আছে? যে ব্যক্তি সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিথ্যার ওপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যেতে চেয়েছে এবং যার এ দুর্মতি দেখে আল্লাহও তার জন্য এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে সত্যের প্রতি তার ঘৃণা এবং মিথ্যার প্রতি আসক্তি আরো বেশী বেড়ে গেছে, তাকে দুনিয়ার কোন্ শক্তি মিথ্যা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে এবং সত্যের ওপর বহাল করতে পারে? যে নিজে ভুল পথে চলতে চায় তাকে জোর করে সঠিক পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নিয়ম নয়। আর মানুষের মনের পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা আল্লাহর ছাড়া আর কারো নেই।

১১১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যে অবস্থায় ছিল, সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামতেও তাদেরকে উঠানো হবে।

১১২. ইতিপূর্বে ৬ রুকূ'র وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা যেসব মনস্তাত্বিক কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ ছিল যে, এভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তাদের মেনে নিতে হতো। আর সাধারণত মানুষ সমকালীন ও কোন পরিচিত–সহযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব খুব কমই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, যাদের কৃপণতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, কারো যথার্থ মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেও যারা মনে ব্যথা পায়, তাদের হাতে যদি আল্লাহ নিজের রহমতের চাবিগুলো দিয়ে দেন তাহলে তারা কাউকে একটি কানাকড়িও দেবে না।

১১৩. এখানে আবার মক্কার কাফেরদের মু'জিযা পেশ করার দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে এবং এটি তৃতীয় জবাব। কাফেররা বলতো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক কাজগুলো করে দেখাবে। জবাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে ফেরাউনকে এমনিতর সুস্পষ্ট মু'জিযা এক দু'টি নয় পরপর ৯টি দেখানো হয়েছিল। তারপর তোমরা জানো মেনে নেবার প্রবণতাই যার ছিল না সে এগুলো দেখে কি বললো? আর এটাও জানো যে, মু'জিযা দেখার পরও যখন সে নবীকে অস্বীকার করলো তখন তার পরিণতি কি হলো?

এখানে যে ন'টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে এর আগে সূরা আরাফেও সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) লাঠি, যা সাপে পরিণত হতো। (২) সাদা হাত, যা বগলের ভেতর থেকে বের করার পর সূর্যের মতো চমকাতে থাকতো। (৩) যাদুকরদের যাদুকে প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাভূত করা। (৪) এক ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া এবং তারপর একের পর এক (৫) তুফান, (৬) পংগপাল, (৭) শস্যকীট, (৮) ব্যাং এবং (৯) রক্তের আপদ নাযিল হওয়া।

১১৪. মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে উপাধি দিতো এটি সেই একই উপাধি। এ সূরার ৫ রুকূ'তে এদের এ উক্তিও এসেছে ঃ

اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا (তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের পেছনে ছুটে চলছো।) এখন এদেরকে বলা হচ্ছে, ঠিক এ একই উপাধিতে ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে ভূষিত করেছিল।

এখানে আর একটি আনুসংগিক বিষয়ও রয়েছে। সেদিকে ইংগিত করে দেয়া আমি জরুরী মনে করি। বর্তমান যুগে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী হাদীসের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠিয়েছে তার মধ্যে একটি আপত্তি হচ্ছে এই যে, হাদীসের বক্তব্য মতে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, একজন যাদু প্রভাবিত ব্যক্তি এটা ছিল কাফেরদের একটি মিথ্যা অপবাদ। হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, এভাবে হাদীস বর্ণনাকারীগণ কুরআনকে মিথ্যুক এবং মক্কার কাফেরদেরকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু এখানে দেখুন কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত মূসার ওপরও ফেরাউনের এ একই মিথ্যা দোষারোপ ছিল যে, আপনি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। আবার কুরআন নিজেই সূরা ত্বা–হা'য় বলছে ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى – فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى –

"যখন যাদুকররা নিজেদের দড়াদড়ি ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাৎ তাদের যাদুর ফলে মূসার মনে হতে লাগলো যে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো দৌড়ে চলেছে। কাজেই মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

মূসা এর জবাবে বললো, "তুমি খুব ভাল করেই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি[১১৫] আর আমার মনে হয় হে ফেরাউন! তুমি নিশ্চয়ই একজন হতভাগা ব্যক্তি।[১১৬]

এ শব্দগুলো কি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করছে না যে, হযরত মূসা সে সময় যাদু প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন? হাদীস অস্বীকারকারীগণ কি এ প্রসংগেও বলতে প্রস্তুত আছেন যে, কুরআন নিজেই নিজেকে মিথ্যা এবং ফেরাউনের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে?

আসলে এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা জানেন না যে, মক্কার কাফেররা ও ফেরাউন কোন্ অর্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মূসাকে 'যাদুগ্রস্ত' বলতো। তাদের বক্তব্য ছিল, কোন শত্রু যাদু করে তাঁদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এবং এ পাগলামির প্রভাবে তারা নবুওয়াতের দাবী করছেন এবং একটি সম্পূর্ণ অভিনব বাণী শুনাচ্ছেন। কুরআন তাদের এ অপবাদকে মিথ্যা গণ্য করেছে। তবে সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির শরীরে বা শরীরের কোন অনুভূতিতে যাদুর প্রভাব পড়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। এটা ঠিক এ রকম ব্যাপার যেমন কারোর গায়ে পাথর মারলে সে আহত হয়। কাফেরদের অপবাদ এ ধরনের ছিল না। কুরআনও এ ধরনের অপবাদের প্রতিবাদ করেনি। এ ধরনের কোন সাময়িক প্রতিক্রিয়ায় নবীর মর্যাদা প্রভাবিত হয় না। নবীর ওপর যদি বিষের প্রভাব পড়তে পারে, নবী যদি আহত হতে পারেন, তাহলে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাবও পড়তে পারে। এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে কি কারণে? নবীর মন–মস্তিষ্ক যদি যাদুর প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এমনকি তিনি যাদুর প্রভাবাধীনেই কথা বলতে ও কাজ করতে থাকেন তাহলেই এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে। সত্য বিরোধীরা হযরত মূসা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিতো এবং কুরআন এরই প্রতিবাদ করেছে।

১১৫. একথা হযরত মূসা (আ) এ জন্য বলেন যে, কোন দেশে দুর্ভিক্ষ লাগা বা লাখো বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ধ্বংসের বিভীষিকা নিয়ে পংগপালের মতো ব্যাঙ বের হয়ে আসা অথবা শস্য গুদামগুলোয় ব্যাপকভাবে পোকা লেগে যাওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য জাতীয় দুর্যোগ দেখা দেয়া কোন যাদুকরের যাদুর বলে বা কোন মানুষের ক্ষমতায় সম্ভবপর ছিল না। তারপর যখন প্রত্যেকটি দুর্যোগ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা ফেরাউনকে এ বলে নোটিশ দিতেন যে, তোমার হঠকারিতা থেকে বিরত না হলে এ দুর্যোগটি তোমার রাজ্যে চেপে বসবে এবং ঠিক তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সেই দুর্যোগটি সমগ্র রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলতো, তখন এ অবস্থায় কেবলমাত্র একজন পাগল ও চরম হঠকারী ব্যক্তিই একথা বলতে পারতো যে, এ বিপদ ও দুর্যোগগুলো পৃথিবী ও আকাশ–মণ্ডলীর একচ্ছত্র অধিপতি ছাড়া অন্য কেউ নাযিল করেছে।

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا
مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

শেষ পর্যন্ত ফেরাউন মূসা ও বনী ইস্‌রাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে এক সাথে ডুবিয়ে দিলাম এবং এরপর বনী ইস্‌রাঈলকে বললাম, এখন তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো,[১১৭] তারপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতির সময় এসে যাবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে এক সাথে হাযির করবো।

এ কুরআনকে আমি সত্য সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি এ ছাড়া আর কোন কাজে পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ দিয়ে দেবে এবং (যে মেনে নেবে না তাকে) সাবধান করে দেবে।[১১৮] আর এ কুরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।[১১৯] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা একে মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[১২০] তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা আনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে, "পাক-পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।"[১২১]

১১৬. অর্থাৎ আমি তো যাদুগ্রস্ত নই, তবে তোমার ওপর নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের পদাঘাত হয়েছে। আল্লাহর এ নিদর্শনগুলো একের পর এক দেখার পরও তোমার নিজের

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ
بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن
لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

এবং তারা নত মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের দীনতা আরো বেড়ে যায়।[১২২]

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ বা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সবই ভাল নাম।[১২৩] *আর নিজের নামায খুব বেশী উচ্চ কন্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কন্ঠেও না, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায়ের কন্ঠস্বর অবলম্বন করবে।*[১২৪] *আর বলো, "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোন পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও নির্ভর হবে।"*[১২৫] *আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।*

হঠকারিতার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তোমার কপাল পুড়েছে।

১১৭. এটিই হচ্ছে এ কাহিনীটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই তাদেরকে শুনানো হচ্ছে, ফেরাউন এসব কিছু করতে চেয়েছিল মূসা ও বনী ইস্রাঈলের সাথে। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে মূসা ও তার অনুসারীদেরকে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি এ একই পথ অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের পরিণামও এর থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

১১৮. অর্থাৎ তোমাদের একথা বলা হয়নি যে, যারা কুরআনের শিক্ষাবলী যাচাই করে হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে তোমরা ঝরণাধারা প্রবাহিত করে, বাগান তৈরী করে এবং আকাশ চিরে কোন না কোনভাবে মুমিন বানাবার চেষ্টা করবে। বরং তোমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই ঃ তোমরা লোকদের সামনে হক কথা

পেশ করে দাও, তারপর তাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও, যে একথা মেনে নেবে সে ভাল কাজ করবে এবং যে মেনে নেবে না সে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১৯. এটি বিরোধীদের একটি সংশয়ের জবাব। তারা বলতো, আল্লাহর পয়গাম পাঠাবার দরকার হলে সম্পূর্ণ পয়গাম এক সংগে পাঠান না কেন? এভাবে থেমে থেমে সামান্য সামান্য পয়গাম পাঠানো হচ্ছে কেন? আল্লাহকেও কি মানুষের মতো ভেবে চিন্তে কথা বলতে হয়? এ সংশয়ী বক্তব্যের বিস্তারিত জবাব সূরা নাহ্‌লের ১৪ রুকূ'র প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বোধ করছি না।

১২০. অর্থাৎ যে আহলি কিতাব গোষ্ঠী আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত এবং যারা তার বাচনভংগীর সাথে পরিচিত।

১২১. অর্থাৎ কুরআন শুনার সাথে সাথেই তারা বুঝতে পারে, যে নবীর আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাসমূহে দেয়া হয়েছিল তিনি এসে গেছেন।

১২২. আহলি কিতাবদের সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল লোকদের এ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার কথা কুরআন মজীদের বহু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আলে ইমরান ১২ ও ২০ রুকূ' এবং আল মায়েদার ১১ রুকূ' দেখুন।

১২৩. এটি মুশরিকদের একটি আপত্তির জবাব। তারা এ মর্মে আপত্তি জানিয়েছিল যে, স্রষ্টার নাম "আল্লাহ" এটা আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এ "রহমান" নাম কোথায় থেকে আনলে? তাদের মধ্যে যেহেতু আল্লাহর এ নামের প্রচলন ছিল না তাই তারা তাঁর রহমান নাম শুনে নাক সিটকাতো।

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবীগণ নামায পড়ার সময় উচ্চকণ্ঠে কুরআন পড়তেন তখন কাফেররা শোরগোল করতো এবং অনেক সময় এক নাগাড়ে গালিগালাজ করতো। এ জন্য হুকুম দেয়া হলো, এমন উচ্চস্বরে পড়ো না যাতে কাফেররা শুনে হৈ-হুল্লোড় করতে পারে আবার এমন নিচু স্বরেও পড়ো না যা তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট অবস্থার সাথে এ হুকুম সম্পৃক্ত ছিল। মদীনায় যখন অবস্থা বদলে গেলো তখন আর এ হুকুম কার্যকর থাকেনি। তবে হাঁ, মুসলমানরা যখনই মক্কার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয় তখনই তাদের এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

১২৫. যেসব মুশরিক বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানী গুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ বাক্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। এ অর্থহীন বিশ্বাসটির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম। তাই তিনি নিজের জন্য কোন সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন। তাঁর কোন ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।